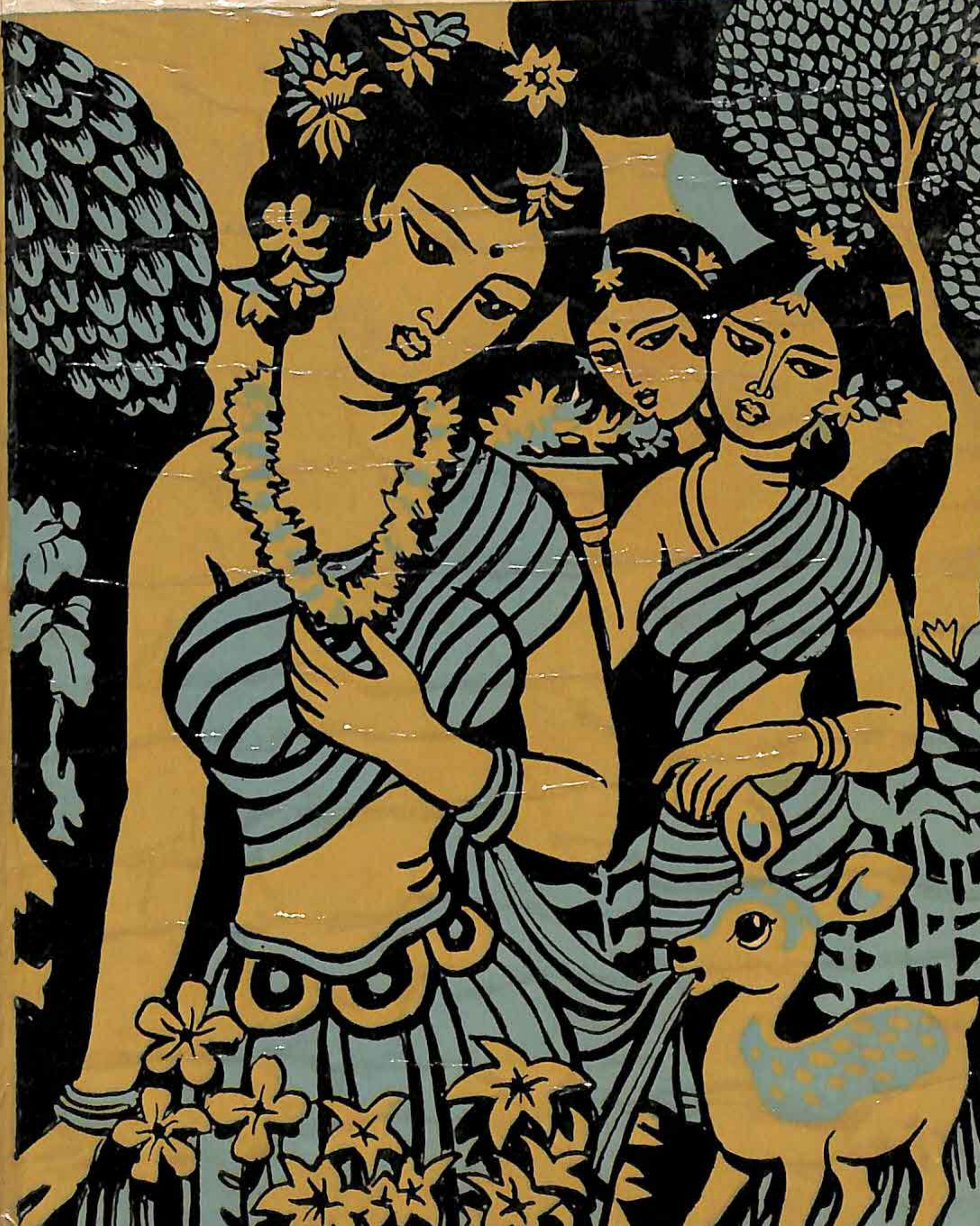
সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প



সংস্কৃত-সাহিত্যের গল্প

সংস্কৃত সাহিত্যের গল্প

প্রসূন বসু
ও
জ্যোতিভূষণ চাকী
সম্পাদিত

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ ১৩৯৪

প্রকাশক ঃ
প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রাকর ঃ পঞ্চানন জানা
জানা প্রিন্টিং কনসার্ন
৪০/১বি শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রচ্ছদ ও ভিতরের ছবি ঃ
শৈল চক্রবর্তী

দাম ঃ ১৫ টাকা

তোমাদের জন্যে

মানুষ যখন খুবই ছেলেমানুষ সেই-সময়েই সে গল্প বেঁধেছে, গল্প বলেছে। যখন কথা লেখায় বাঁধা পড়েনি তখনকার কত গল্পই না হারিয়ে গিয়েছে! তবে হারিয়ে গেলেও তারা ফুরিয়ে যায়নি, নানা দেশবিদেশ ঘুরে তারা নতুন নতুন রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে।

বেদ আর উপনিষদের ঋষিরা মন্ত্রের মধ্যে আকাশ-মাটি-মানুষের সম্বন্ধে কত গভীর কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁরাও অনেকক্ষেত্রে গল্পকেই প্রকাশের মাধ্যম করেছেন, যার মধ্যে নাট্যরসের আভাসও লক্ষণীয়।

আমাদের রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কথায় গল্পের মধ্যেই কত গল্প। এই সব সংস্কৃত গ্রন্থ আমাদের কল্পতরুর মতো। এই সব গ্রন্থ থেকে উপাদান নিয়ে তাতে নিজেদের কল্পনার রঙ মিশিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকেরা। সম্পূর্ণ মৌলিক রচনাও তাঁরা উপহার দিয়েছেন প্রচুর। এই সব মিলিয়ে যুগযুগ ধরে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্ষেত্র হয়েছে সুবিশাল। কোনোটাকে আমরা বলি মহাকাব্য, কোনোটাকে খণ্ডকাব্য, কোনোটাকে নাটক, কোনোটাকে বা গদ্যকাব্য—কথা বা আখ্যায়িকা। এর মধ্যে যা শুধু শোনবার তা 'শ্রব্য' আর যা অভিনয় করে দেখাবার তা 'দৃশ্য'। আমার শ্রব্য-দৃশ্য দুরকম কাব্যই সংকলিত করেছি এই গ্রন্থে। এ সংকলনে আছেন অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস আর ভারবি।

অশ্বঘোষ প্রথম শতকের কবি। এঁর মহাকাব্য 'বুদ্ধচরিত' দিয়ে আমাদের গ্রন্থের শুরু। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্যে যিনি মঙ্গলবার্তা বহন করে এনেছেন সেই বুদ্ধদেবের জীবন-কাহিনী নিয়েই 'বুদ্ধচরিত'।

ভাসের কথা কালিদাস প্রমুখ কবি এবং আলংকারিকেরা উল্লেখ করলেও তাঁর রচনার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি দীর্ঘকাল। ১৯১০ সালে পণ্ডিত গণপতি শাস্ত্রী ত্রিবান্দ্রামে তেরোটি নাটকের সন্ধান পান। এই তেরোটি নাটকই ভাসের রচনা বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমরা এর মধ্যে 'পঞ্চরাত্র', 'প্রতিমা নাটক', 'অবিমারক' ও 'স্বপ্নবাসবদত্তা'—এই চারটি নাটকের কাহিনী উপহার দিচ্ছি। বিভিন্ন স্বাদের নাটক এগুলো। অশ্রু আর অসির ঝঙ্কার দুই-ই পাবে এই নাটকগুলিতে।

ভাসের সময় নিয়ে তর্ক আছে। তবে তিনি কালিদাসের পূর্ববর্তী। কালিদাস সম্ভবতঃ পঞ্চম শতকের কবি। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' 'মেঘদূত,' 'কুমার সম্ভব' আর 'রঘুবংশ' এই চারটি রচনার গল্পই এখানে পরিবেশিত হয়েছে—, প্রথমটি নাটক, দ্বিতীয়টি খণ্ডকাব্য, বাকি দুটিই মহাকাব্য। গল্প বল, বর্ণনা বল, উপমা বল, সংলাপ বল—সব কিছুতেই কালিদাসের জুড়ি মেলা ভার। যা সুন্দর তাকে অমন সুন্দর ক'রে আর কে এঁকেছেন।

এ সংকলনে আর-একজন আছেন, তিনি ভারবি—ষষ্ঠ শতকের কবি। এঁর মহাকাব্য 'কিরাতার্জুনীয়ে'র কাহিনীও এতে আছে। কিরাত-বেশী মহাদেবের সঙ্গে তপস্বী অর্জুনের তুমুল যুদ্ধ এবং অর্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ এই মহাকাব্যেব বিষয়বস্তু। ভারবির অর্থ-গৌরব প্রবাদ বচনের মতো। শব্দার্থের ব্যঞ্জনাবিন্যাসে তিনি আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই-সব রচনায় তখনকার মানুষ, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের চিন্তাভাবনা এ সবের পরিচয় ফুটে উঠেছে। সংক্ষিপ্তসারে হলেও এই সব সাহিত্য-রচনার প্রাথমিক স্বাদ যাতে তোমরা পাও সেই জন্যেই আমাদের এ আয়োজন।

গল্পগুলো পরিবেশন করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা, ছবি এঁকেছেন শৈল চক্রবর্তী।

তোমাদের জন্যে অল্পের মধ্যে বহুকে ধরবার চেষ্টা করা গেল। তোমরা চাইলে সংস্কৃতের সোনার খনি থেকে আরও কিছু উপহার দেবার জন্যে প্রস্তুতি নেব।

নববর্ষ
১. ১. ৯৪

জ্যোতিভূষণ চাকী
প্রসূন বসু

সূচীপত্র

বুদ্ধচরিত ॥ অশ্বঘোষ

অভ্র রায়

॥ ১ ॥

বুদ্ধদেবকে নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। তথাগতের চরণ চিহ্ন ধারণ করেই একদিন কৃতার্থ হয়েছিল ভারতভূমি। তাঁর বাণী ও ধর্মমতের প্রথম প্রচার লাভেও ধন্য এই দেশ। আজও অনেক মনীষী ভারতবর্ষকে সম্মান জানিয়ে বলেন—গৌতম বুদ্ধের দেশ।

অবাক হতে হয়, যিশুখ্রীস্টের জন্মেরও কত যুগ আগে বুদ্ধদেব যে জাতি বৈষম্যহীন ঐক্যবোধ ও মৈত্রীর কথা বলে গেছেন আজও তা থেকে মহত্তর কোনো জীবনাদর্শের কথা ভাবতে পারে না মানুষ। আবহমান কাল ধরে ভারতবর্ষ এই নীতিকেই শ্রেষ্ঠ বলে মেনেছে। গৌতম বুদ্ধ ও সম্রাট অশোকের কাল পেরিয়ে বর্তমান কালের মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সেই করুণা অহিংসা আর মৈত্রীর আদর্শকেই মহত্তম বলে মান্য করা হয়েছে।

স্বভাবতই সেই করুণাঘন মহাপুরুষের জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক কাব্য-কাহিনী। অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত' তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম প্রাচীন রচনা। কবি অশ্বঘোষ, বিশেষ করে এই মহাকাব্যটির জন্যেই সংস্কৃত সাহিত্যে বিখ্যাত। যদিও মনে রাখতে হবে একাব্যের প্রতিটি উপাখ্যানই পরিপূর্ণভাবে ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না। অশ্বঘোষ কাব্য রচনা করেছেন, ইতিহাস নয়। আর একথা কে না জানে, প্রতিটি মহাপুরুষের জীবনেই জড়িয়ে থাকে অজস্র কল্প-কাহিনী আর কিংবদন্তীর মালা। বুদ্ধদেবও তার ব্যতিক্রম

নন। মহাকবিরা কল্পনার নেত্রে সেই কাহিনীপুঞ্জ থেকে আলোকিত করে নেন কালজয়ী মহাপুরুষের এক নিখাদ সত্যমূর্তি। কবি 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি।'

দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ভাষায়—The truth is not factual, it is not a copy of reality but a higher reality.

'বুদ্ধচরিত'-ও তেমনি কিংবদন্তী জড়িত এক সুন্দর সত্যমূলক উপাখ্যান। কাহিনীটি শুরু হয়েছে বুদ্ধদেবের পিতা শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের শৌর্য ও গরিমার পরিচয় দিয়ে। তিনি ছিলেন কপিলাবস্তুর রাজা। সৌন্দর্যময়ী তাঁর মহিষীর নাম মায়াদেবী। ধনে জনে পরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ।

নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তিতে জীবন কাটে রাজা ও রানীর। এমন সময় একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন মায়াদেবী : চাঁদের মতো সুন্দর এক শ্বেতহস্তী শাবক তাঁর দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে……। চমকে জেগে উঠলেন রানী, এ কি! কিন্তু তিনি ভীত হলেন না। অবিচলিত চিত্তে ক্রমে অনুভব করলেন, তিনি এবার মা হতে চলেছেন। তাঁর গর্ভে আসছে দেবদুর্লভ কোনো সন্তান। সংবাদ ছড়িয়ে গেল রাজপুরীতে। আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে রাজপ্রাসাদ। দিনে দিনে উদীয়মান সূর্যের মতো অপরূপ রূপলাবণ্যে শোভিত হয়ে উঠতে লাগলেন সন্তানসম্ভবা জননী।

ক্রমে আগত হয় প্রসবের দিন। মায়াদেবী তখন রাজপুরী ছেড়ে লুম্বিনী বনে প্রবেশ করলেন। কারণ সুন্দর এই অরণ্যকেই তিনি তাঁর ভাবী সন্তানের উপযুক্ত প্রসবভূমি বলে বিবেচনা করলেন। সেখানে লতাবিতানের শয্যায় আশ্রয় নিলেন জননী। এগিয়ে এল জন্মের সেই শুভক্ষণ। ব্রতশুদ্ধ দেবীর পার্শ্বদেশ থেকে কোনো বেদনার সঞ্চার না করে জাত হলো চাঁদের মতো শিশুটি।

দৈববাণী শোনা গেল—জগতের কল্যাণের জন্যেই আমি এসেছি। সংসারে এই আমার শেষ জন্ম।



চারদিকে যেন এক অভাবনীয় আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। কেঁপে উঠল বিশ্বভুবন। মধুময় হয়ে উঠল আকাশ বাতাস। মধুর মর্মরধ্বনিতে, বিহঙ্গের কূজনে সাড়া পড়ে গেল অরণ্যভূমিতে। নির্মেঘ আকাশ জুড়ে কে যেন বাজিয়ে তুলল নিরন্তর দুন্দুভি ধ্বনি।

রাজ্যের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এইসব শুভ লক্ষণ দেখে উল্লসিত হয়ে ছুটে এসে রাজাকে বললেন—মহারাজ! আনন্দ করুন। নৃত্যোৎসবের আয়োজন করুন আজ। অসামান্য এক পুত্ররত্নের জন্ম হয়েছে আপনার বংশে। সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করবেন এই কুমার। লোকনেতা হিসেবে বিশ্ববন্দিত হবেন ইনি।

আজ সত্যিই বড় আনন্দের দিন রাজার। তিনি খুশি হয়ে সেই ব্রাহ্মণদের ধনদানে সম্মানিত করলেন।

এদিকে মহর্ষি অসিত তপোবলে বুদ্ধের জন্মের কথা জানতে পেরে শাক্যরাজের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, ভবিষ্যতে মহাজ্ঞানী হবেন আপনার পুত্র। আমি একবার তার দর্শন লাভ করতে চাই। কুমারকে দেখলেন ঋষি। শুভলক্ষণ যুক্ত অপূর্ব কান্তি। নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল ঋষির। বললেন, হায়! আমার যাবার সময় হয়ে এল। আর তখন তুমি এলে এ ধরায়!

পরে রাজার দিকে ফিরে তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, ভীত হবেন না মহারাজ। রাজকুলে জন্ম নিলেও ইনি বিষয়ে উদাসীন হবেন। কঠিন সাধনায় পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবেন একদিন। কাণ্ডারী এসেছেন ধরাধামে। অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করবেন অসহায় মানুষদের। সুতরাং আপনি এর জন্যে কোনো শোক করবেন না। পুত্রবৎসল রাজাকে এইভাবে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করে বিদায় নিলেন মহর্ষি।

দশদিন পূর্ণ হলো কুমারের বয়েস। মহা ধুমধামে নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করলেন রাজা। মুক্ত হস্তে ব্রাহ্মণদের দান করলেন। মায়া-

দেবী সবাইকে প্রণাম করে রাজধানীতে যাত্রা করলেন এবার। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কপিলাবস্তু নগরী।

॥ ২ ॥

কুমারের জন্মের পর থেকেই নানা শুভলক্ষণ দেখা দিতে থাকল নগরীতে। শস্য সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল রাজ্য। শত্রু মিত্র হলো, ধর্মের জাগরণ ঘটল, পাপীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে থাকল ক্রমশ। চারদিকে এরকম শ্রীবৃদ্ধি ও সিদ্ধিলাভের জন্যেই নবজাতকের নাম হলো 'সর্বার্থসিদ্ধ' বা সিদ্ধার্থ। কিন্তু এত সৌভাগ্য ও আনন্দের প্লাবন বুঝি ভাগ্যে সইল না মায়াদেবীর। দেবোপম নয়নের মণি সিদ্ধার্থকে রেখে হঠাৎ একদিন স্বর্গে চলে গেলেন। মাতৃস্বসা গৌতমী তখন জননীর ভালবাসায় বুকে তুলে নিলেন কুমারকে। গৌতমীর কাছে লালিত হয়ে তাই কুমারের অপর নাম হলো গৌতম।

যথাকালে কুমারের উপনয়ন হলো। রাজকুমারের উপযোগী বহুবিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে তিনি বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে থাকলেন। কিন্তু কুমারের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হবে মুক্তি—অসিতের এই কথা মনে রেখে সব সময়ই চিন্তিত রাজা। সর্বদাই চেষ্টা কী ভাবে তাঁকে ভোগ সুখের মধ্যে ভুলিয়ে রাখবেন। যশোধরা নামে রূপেগুণে অতুলনীয়া এক রমণীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন পুত্রের। পুরবাসীদের নির্দেশ দিলেন সর্বক্ষণ যেন প্রাসাদের মধ্যেই আনন্দে উপভোগে তারা ব্যাপৃত রাখে সিদ্ধার্থকে।

ফলে নিশ্চিন্ত সুখ ভোগের মধ্যে দিন কাটে সিদ্ধার্থের। চারদিকে কেবল নৃত্যগীত আর আনন্দের বিচিত্র উপকরণ। এর মধ্যে রাহুল নামে এক পুত্রের পিতা হলেন তিনি। রাজধানীতে আবার আনন্দের বন্যা। দান ধ্যান যজ্ঞ।

কিন্তু সিদ্ধার্থ যেন হাঁপিয়ে উঠলেন এই একঘেয়ে জীবনে। ঠিক করলেন এবার অরণ্যে বেড়াতে যাবেন। পিতা শুদ্ধোদন সঙ্গে সঙ্গে

সব ব্যবস্থা করে দিলেন। অনাথ আতুর আর বিকলাঙ্গদের সরিয়ে রাজপথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হলো। পাছে দুঃখদায়ক কোনো দৃশ্য কুমারের চোখে পড়ে। কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও যা ঘটবার তাই ঘটে গেল। জরাগ্রস্ত এক পুরুষকে কুমারের দৃষ্টিগোচর করিয়ে দিলেন দেবতারা।

জরায় আনত শিথিল শীর্ণ সেই মানুষটিকে দেখে বিচলিত হলেন কুমার। প্রশ্ন করলেন,

—এ কে সারথি? এ ব্যক্তির এমন দুর্দশা হলো কি করে?

—কুমার ইনি একজন জরাগ্রস্ত মানুষ। যৌবন হারিয়ে বয়সের স্বভাবধর্মে এই অবস্থায় উপনীত।

—সবারই কি এই অবস্থা আসে?

—হ্যাঁ কুমার।

—তাহলে আমিও কি একদিন এই আকৃতি ধারণ করব?

—অবশ্যই কুমার।

সঙ্গে সঙ্গে রথের মুখ ঘুরিয়ে নিতে বললেন কুমার। গৃহে ফিরে ভীষণ দমে যায় মন। কী হবে তাহলে অনর্থক এই বিলাসে ভোগে কাল কাটিয়ে। সব কিছু যেন শূন্য আর নিরানন্দ মনে হয় তাঁর।

কিছুদিন পর আবার একদিন এইভাবে রাস্তায় বেরিয়ে তিনি দেখলেন, কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত একজন মানুষ। এটাও দেবতাদের পরিকল্পনা মতো ঘটল। লোকটা যন্ত্রণায় মা-মা বলে চিৎকার করছে পথের মধ্যে। সারথিকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, শরীর থাকলেই এই ব্যাধিভয় অবশ্যম্ভাবী। আবার রথের মুখ ফেরে রাজ-প্রাসাদের দিকে।

তৃতীয় বারে কুমার মুখোমুখি হলেন মানবজীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনাটির সঙ্গে। যদিও রাজার দিক থেকে সতর্কতার কোনো ত্রুটি ছিল না। সমস্ত রাজপথ পরিষ্কার করে রেখেছিলেন আগে থেকে। পুত্র অরণ্যে যাবেন জেনে প্রমোদ উদ্যানে পাঠিয়েছেন

রাজ্যের সেরা নর্তকী আর গায়িকাদের। নানা কৌশলে কুমারের চিত্ত বিনোদন করে আবার তাঁর মন আনন্দে ভরিয়ে দিতে হবে তাদের।

কিন্তু দেবতাদের অভিপ্রায় তো অন্যরূপ। তাঁরা নির্মাণ করলেন একটি মানুষের মৃতদেহ। চারজন লোক সেটিকে বহন করে নিয়ে যেতে থাকল সিদ্ধার্থের সামনে দিয়ে।

সারথিকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন কুমার, এই-ই নিয়তি মানুষের।

এমনিভাবেই একদিন প্রিয়জনদের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় মানুষ। পরিত্যক্ত হয় একখণ্ড বাতিল কাঠের টুকরোর মতো।

জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু। পরপর এই তিনটি অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে পড়লেন কুমার। তবে কেন আর এই অরণ্য ভ্রমণ। রথের মুখ ফেরাতে নির্দেশ দেন সারথিকে। কিন্তু এবার কিছুতেই রাজী হয় না সারথি। রাজাজ্ঞায় সে নিয়ে চলল কুমারকে সেই সুন্দরী পরিপূর্ণ পত্রপুষ্পে শোভিত মনোরম প্রমোদকুঞ্জে।

কিন্তু ধরে রাখা গেল না কুমারকে। সমস্ত সুন্দর দৃশ্য, প্রণয়-নিপুণ নারীদের ছলাকলা সবই ব্যর্থ হলো। অনিত্য এই জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে অসুখী উদাসীন রাজপুত্র আবার গৃহেই ফিরলেন। রাজা ভীত হয়ে পড়েন পুত্রের ভাবান্তর দেখে। রাতে ঘুম নেই চোখে। সবই বুঝি ব্যর্থ হলো। কী করে তাহলে সংসারে বেঁধে রাখবেন বৈরাগী সিদ্ধার্থকে।

॥ ৩ ॥

বড় অশান্ত রাজপুত্রের মন। সারাদিন এক বিষণ্ণ উদাসীনতায় মগ্ন হয়ে থাকেন। লোকজন আমোদ-প্রমোদ কিছুই ভাল লাগে না। ঠিক করলেন বনে যাবেন তিনি। গভীর বনভূমিতে কিছুদিন কাটিয়ে মন শান্ত করে ফিরবেন। রাজা অনুমতি দিলেন, বেশ তো ঘুরে এস। মন্ত্রিপুত্রদের সঙ্গে নিয়ে বেড়িয়ে এস অরণ্যে।

তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থককে বহুমূল্য পোষাকে সজ্জিত করা হলো।

কুমারকেও সাজিয়ে দেওয়া হলো চোখ জুড়োনো মণিমুক্তা আর মুকুটে। শেষে কন্থকের পিঠে চেপে টগবগিয়ে গভীর বনে চললেন রাজপুত্র। মন্ত্রিপুত্ররা চলল তাঁর পিছন পিছন।

হঠাৎ কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল আবার। জঙ্গলের মধ্যে একটা জমি চাষ করে গেছে চাষীরা। সেখানে থেমে দাঁড়ালেন কুমার। চোখে পড়ল চষা জমিতে লাঙলের ফলায় ছিন্ন রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে কয়েকটি কীট-পতঙ্গের শরীর। হায়! সহসা দুলে ওঠে মন। করুণায় আপ্লুত কুমার নেমে পড়লেন সেখানে। মাটিতে বসে থাকলেন স্তব্ধ হয়ে। বসে বসে জীবন ও জগতের অনিত্যতা ও অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা ভাবতে থাকলেন।

অবশেষে অন্যের চোখে অদৃশ্য এক ভিক্ষুবেশধারী পুরুষ এসে সামনে দাঁড়ালেন তাঁর।

—কে আপনি? প্রশ্ন করেন কুমার।

—জন্ম-মৃত্যু ভীত আমি এক শ্রমণ। ভিক্ষান্ন সম্বল করে পরমার্থের সন্ধানে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি।

দৈবপ্রেরিত এই পুরুষটির কাছেই কুমার সহসা যেন তাঁর পথের হদিশ পেয়ে গেলেন। তাই তো! রাজ্যসুখ আর নয়! সব ত্যাগ করতে হবে তার জন্যে। ছিন্ন কন্থা পরে ভিক্ষুবেশে তাঁকেও যে এমনি পথে পথে ঘুরতে হবে।

প্রাসাদে ফিরে এসে বিনীতভাবে পিতার কাছে গৃহত্যাগের অনুমতি চাইলেন সিদ্ধার্থ।

—না-না, বৎস! সে হয় না, আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন রাজা। এই দুর্বুদ্ধি ত্যাগ কর কুমার। তোমার ধর্মকর্ম করার বয়েস যে এখনো পড়ে আছে বাবা!

চারদিকে কঠোর পাহারার ব্যবস্থা হলো রাজপুত্রের জন্যে। রাজনির্দেশ, কিছুতেই যেন সে প্রাসাদের বাইরে না যায়। সুন্দরী নারীদের প্ররোচিত করা হলো। নানা ছলাকলায় নৃত্যগীতে কুমারের

মনোহরণ করতে সর্বক্ষণ তাঁকে ঘিরে রইল তারা। কিন্তু সবই নিষ্ফল। দৈব নির্দেশে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

এই তো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ! প্রিয় অনুচর ছন্দককে জাগিয়ে নির্দেশ দিলেন সিদ্ধার্থ—এখনি কন্থককে সাজিয়ে আন।

অমৃতের আকাজ্ক্ষা জেগেছে অন্তরে। পার্থিব কোনো বাধাই যে আর বাধা নয়। দৈব প্রভাবে নগরীর বিশাল দরজাগুলি আপনা আপনি খুলে যেতে থাকল। আর দ্রুতগামী সেই অশ্ব কন্থক, উন্মুক্ত পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। পিঠে নিয়ে তার প্রিয় রাজপুত্রকে। যিনি রাত্রি নিশীথে গৃহত্যাগ করে চিরবিদায় নিচ্ছেন রাজ্য থেকে। পিছনে পড়ে রইল তাঁর নয়নের মণি রাহুল, প্রিয়তমা যশোধরা, পিতা শুদ্ধোদন, মাতা গৌতমী আরও কত প্রিয় পরিজন!

তবু কোনো খেদ নেই মনে। বরং সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে তাঁর দুর্জয় সংকল্প। নগরীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সিংহনাদে বলে ওঠেন একবার—জন্ম-মৃত্যুর পার না দেখে আমি কিছুতেই ফিরব না আর।

অবশেষে ঘোড়া ছুটিয়ে ভার্গব মুনির আশ্রমে এসে থামলেন রাজপুত্র। শ্রান্ত ঘর্মাক্ত কলেবর। তবু প্রসন্ন কণ্ঠে ছন্দকের দিকে ফিরে বললেন—এবার তুমি কন্থককে নিয়ে ফিরে যাও, বন্ধু। আমি এসে গেছি আমার প্রার্থিত পথে।

অঙ্গ থেকে রাজ অলঙ্কারগুলি খুলে ছন্দককে দিয়ে বললেন—বন্ধু, এগুলো এখন থেকে তোমার। মুকুটের মহামূল্যবান মণি খসিয়ে বললেন, এটি রাজার চরণে নিবেদন করে বলো, জন্ম-মৃত্যু ভয় নাশের জন্যেই আমি সংসার ছেড়ে এসেছি। কোনো ক্রোধ বা অভিমানের বশে নয়।

দুঃখে মুহ্যমান হলেন ছন্দক। অনেক অনুরোধ করলেন কুমারকে ফিরে যাবার জন্যে। বললেন, এই মর্মান্তিক বিচ্ছেদ সংবাদ নিয়ে আমি কী করে নগরীতে গিয়ে মুখ দেখাব। অশ্রু গড়িয়ে পড়ে

প্রিয় অশ্ব কন্থকেরও দুচোখ বেয়ে। কিন্তু তবু সংকল্প টলে না কুমারের।

প্রবোধ দিয়ে বললেন, বৃথা শোক করো না, বন্ধু। বিচ্ছেদ তো প্রতি মুহূর্তেই আমাদের জীবনে ঘটছে। দেখনি, আকাশের গায়ে ভেসে থাকা মেঘের টুকরোগুলি ভাসতে ভাসতে কেমন এক হয়ে যায়। চোখের পলকে পরক্ষণেই তা আবার কত সহজে ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়। সংসারের সব মিলনই তো এমনি বন্ধু। এক অলীক স্বপ্নের মতো। বল তো কোথায় আজ আমার গর্ভধারিণী জননী? তবে কেন আর এই অহেতুক সন্তাপ বন্ধু!

কথা বলতে বলতেই রাজকুমার মাথা থেকে মুকুটটি খুলে নিলেন। তারপর তরবারির এক আঘাতে টুকরো টুকরো করে সব ছড়িয়ে দিলেন আকাশে। অন্তরীক্ষ থেকে দেবতারা যেন সাদরে তুলে নিলেন সেই উজ্জ্বল চূর্ণগুলি।

পোষাকও পরিবর্তিত হয়ে গেল। ব্যাধের ছদ্মবেশে আগত এক দেবতার কাছ থেকে তাঁর গৈরিক বস্ত্র ধারণ করলেন রাজপুত্র। নিজের বহুমূল্য রাজকীয় বেশের বিনিময়ে।

তারপর সেই গৈরিকধারী কীর্তিমান মহাত্মা ধীরে ধীরে আশ্রম-ভূমির মধ্যে প্রবেশ করলেন।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি
ধরিতে দরিদ্রবেশ।

॥ ৪ ॥

আশ্রমবাসীরা সাদরে অভ্যর্থনা জানাল সিদ্ধার্থকে। কিন্তু তপস্বীদের সাধনপন্থায় তাঁর ঈপ্সিত সত্যকে খুঁজে পেলেন না। তাঁর লক্ষ্য নির্বাণ, আর ঋষিদের অভিপ্রেত স্বর্গ। কুমারের সংকল্পের কথা জেনে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ পরামর্শ দিলেন—হে ধীমান, এখানে নয়,

আপনি বিন্ধ্য পর্বতে অরাড় মুনির আশ্রমে গমন করুন। তাঁর কাছেই আপনি আপনার পথের সন্ধান পেতে পারেন।

এদিকে ছন্দক নগরে ফিরলে রাজধানীতে শোকের ছায়া নেমে এল। যশোধরা শোকে অধীর। বিলাপ করতে লাগলেন—হায়! আমি কেন তখন ঘুমিয়ে ছিলাম? ছন্দক, বল বল, কোথায় তাঁকে তুমি রেখে এলে। কেন রেখে এলে? এইভাবে কখনো অভিযোগ করেন, কখনো মূর্ছায় অচেতন হয়ে পড়েন তিনি।

মাতা গৌতমীও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। আর পিতা শুদ্ধোদনের অবস্থা তো রামচন্দ্রের বনগমনের পর রাজা দশরথের মতো। ঘন ঘন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন কেবল।

অবশেষে স্থির হলো মন্ত্রী এবং পুরোহিতেরা কুমারকে ফিরিয়ে আনতে যাবেন।

প্রতিনিধি দলটি ভার্গবের আশ্রম হয়ে অরাড় মুনির আশ্রমের পথে অগ্রসর হলেন। পথেই এক গাছের তলায় দেখা হলো তাঁদের কুমারের সঙ্গে। বিনীতভাবে তখন নিবেদন করলেন তাঁরা সব কথা। কী নিদারুণ বিচ্ছেদ বেদনায় মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছেন পুরবাসী সবাই।

কুমার শান্ত অবিচলিত স্বরে বললেন—জানি, কিন্তু আমি নিরুপায়। রাজপ্রাসাদের সুখ, ঐশ্বর্য কি কখনো ধর্মের আশ্রয় হতে পারে? বিষয় ভোগের লালসায় আর কখনো সেই বন্ধনের মধ্যে ধরা দিতে পারি না। আমি গৃহত্যাগী হয়েছি মানুষের সমস্ত দুঃখের মূল বিনাশের জন্যে। যদি অসফল হই, বরং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব, তবু ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরে যাব না।

ভীষণ এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে পুরোহিতেরা নিরুত্তর রইলেন। অবশেষে দুঃখিত চিত্তে নগরের পথে ফিরে গেলেন।

সিদ্ধার্থ রাজগৃহ নগরে (বর্তমান রাজগীর) প্রবেশ করলেন এরপর। দলে দলে লোক এল সেই ভিক্ষুবেশী রাজপুত্রকে দেখতে। স্বয়ং রাজা

বিম্বিসার এলেন সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে। যুবক রাজপুত্রের এই ভিক্ষুবেশ দেখে বারবার অনুরোধ করলেন এই পথ ত্যাগ করতে। এমনকি নিজের রাজত্বের অর্ধেক দান করতে চাইলেন তাঁর বন্ধুত্বের বিনিময়ে।

কুমার বললেন, তা হয় না রাজা। যদিও আপনার প্রস্তাব প্রিয় বন্ধুর মতোই। কিন্তু সংসারে আর আমার মন আনন্দ পায় না। যেখানে জরা ব্যাধি মৃত্যু নেই, যেখানে উদ্বেগ নেই, সেই পরম পুরুষার্থই আমার একমাত্র কাম্য। তারই উদ্দেশ্যে আমি চলেছি অরাড় মুনির আশ্রমে। আপনার অনুরোধ রক্ষায় আমি অক্ষম বলে মার্জনা করুন বন্ধু।

সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে বললেন বিম্বিসার, তাই হোক কুমার। অভীষ্ট লাভ করে সার্থক হোক আপনার তপস্যা। একটা অনুরোধ শুধু, সিদ্ধিলাভের পর আমি যেন অনুগ্রহ পাই আপনার।

—তথাস্তু, বলে সিদ্ধার্থ আবার যাত্রা করলেন তাঁর পথে।

॥ ৫ ॥

অবশেষে অরাড় মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন সিদ্ধার্থ। গৌতমের গৃহত্যাগের কথা মুনি আগেই শুনেছিলেন। এখন নবীন তপস্বীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। সকল জ্ঞান তিনি উজাড় করে দিতে চাইলেন এই তরুণ তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে।

সিদ্ধার্থের অভিপ্রেত, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া। অরাড় সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিতে যোগ ও মুক্তির উপায় সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন তাঁকে। কিন্তু মন ভরল না কুমারের। উৎকৃষ্টতর সত্যের সন্ধানে তখন তিনি চললেন উদ্রকের আশ্রমে। তবুও মেলে না তাঁর অভিপ্রেত সত্যের সন্ধান।

গয়ার কাছে নিরঞ্জনা নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন সিদ্ধার্থ। সেখানেই কঠিন তপস্যায় কৃতসংকল্প হয়ে বসলেন। ভাবলেন, সত্য উপলব্ধির এই হলো একমাত্র উপায়। দিন গড়িয়ে চলে। দীর্ঘদিনের উপবাসে অনাহারে অস্থিচর্মসার মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে শরীর। নিস্তেজ তনু-মন।

ভুল ভাঙল ছ বছর পরে। বুঝলেন, বৃথা এই শরীর ক্ষয়। অনাহারে ক্লিষ্ট অসুস্থ এই শরীরে কী করে পরিপূর্ণ সত্যের উপলব্ধি হবে। সত্য ও শান্তি লাভের জন্যে চাই স্থির ও প্রশান্ত চিত্ত। সুতরাং এ পথও বর্জনীয়।

নতুনভাবে তপস্যার উদ্দেশ্যে নিরঞ্জনা নদীতে স্নান করলেন সিদ্ধার্থ। তীরে উঠে হঠাৎ দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দরী এক রাজকন্যা। পরনে নীল উত্তরীয়, শাঁখের মতো সাদা দু হাতে ধরা এক থালা পায়েস। সে প্রণাম করে সেই থালাটি উৎসর্গ করল সিদ্ধার্থকে। বিনা দ্বিধায় কুমার তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন সেই সুখাদ্য।

দৈবপ্রেরিত সেই নারী ছিলেন গোপরাজ কন্যা নন্দবালা। সিদ্ধার্থকে আহারে তৃপ্ত করিয়ে জন্ম সার্থক হলো তাঁর।

স্নান-আহারে তৃপ্ত শরীরে নতুন শক্তি আসে যেন। সিদ্ধার্থ এক তৃণচ্ছেদকের কাছ থেকে তৃণ সংগ্রহ করে নতুন করে ধ্যানে বসলেন আবার। দৃঢ় সংকল্পে ঘোষণা করে বললেন—যতদিন সফল না হই, ততদিন আমি আমার এই আসন ত্যাগ করব না।

সমস্ত বনরাজি যেন তখন স্তম্ভিত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সিদ্ধার্থের সিদ্ধিলাভের অপেক্ষায়।

॥ ৬ ॥

শাক্যমুনি সিদ্ধার্থের কঠিন প্রতিজ্ঞায় বিশ্বচরাচর আনন্দিত। বোধিলাভ করতে চলেছেন তথাগত। পৃথিবীতে সুসময় আসন্ন।

কিন্তু ধর্মের শত্রু 'মার' এতে খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। নানাভাবে সে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে এগিয়ে এল তার অশুভ শক্তি নিয়ে। সিদ্ধার্থ হিমালয়ের মতো অটল। ভ্রূক্ষেপই করেন না মারের তীর নিক্ষেপে। মার যেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে আরো। বিকটদর্শন ভূত-প্রেতদের নিয়ে একসঙ্গে চারদিক থেকে আক্রমণ করে প্রভুকে। কী ভয়ঙ্কর

সেই অবস্থা। কালো অন্ধকার ঘনিয়ে এল সহসা, পৃথিবী কাঁপতে লাগল থরথর করে, প্রচণ্ড ঝড় উঠল চারদিকে, দারুণ গর্জন, ঝলকে ঝলকে আগুন দিকে দিকে—তার মধ্যে বীভৎসদর্শন সব ভূতের দল।

ভয়ঙ্কর সেই দুর্যোগে বা ভূত-প্রেতদের দেখেও কিন্তু সিদ্ধার্থ উদ্বিগ্ন হন না। যেন খেলায় মত্ত কিছু অবোধ শিশুদের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তিনি চেয়ে দেখছেন। অপূর্ব এক প্রসন্নতায় উজ্জ্বল তাঁর মুখমণ্ডল।

তখন মারের প্রতি আকাশ থেকে দৈববাণী হলো—মার, তুমি বৃথা চেষ্টা করো না। বোধির জন্যে জন্ম জন্মান্তরে ইনি যে পুণ্য কর্মরাশি পুঞ্জিত করেছেন আজ তার ফললাভের দিন।

দৈববাণী শুনে মার হাল ছেড়ে দিয়ে পরাজিত হয়ে প্রস্থান করল। মুহূর্তে দুর্যোগ থেমে যায়। শান্ত আকাশ বাতাস। দেবতারা পুষ্প-বৃষ্টি করছেন স্বর্গ থেকে। সিদ্ধার্থ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আবার।

সিদ্ধিলাভের মুহূর্ত আগত তখন। রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্বজন্মের কথা স্মরণে এল প্রভুর। কী আশ্চর্য। একে একে সহস্র জন্মের পরম্পরা দর্শন করতে পারলেন তিনি। যেন চাকার মতো ঘুরছে এই জগৎটা। বারবার প্রিয়জনদের ছেড়ে নতুন নতুন বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছে সবাই। বিরামহীন বেদনা ও বিলাপের কান্না তার জন্যে। তবু ক্ষান্তি নেই আসক্তির। অসার এই সংসার বাসনায়।

নির্মল দর্পণে সারা বিশ্বকে দর্শন করলেন তপস্বী। করুণা হলো জীবের পাপের অসহায় ফলভোগ দেখে। মানুষেরা হাসতে হাসতে যে পাপ করে চলেছে পরিণামে কাঁদতে কাঁদতে তারই ভয়ঙ্কর ফলভোগ করছে। ঈর্ষায়-আসক্তিতে পাপে-দুঃখে পীড়িত এই হতভাগ্যরা যদি জানত তাদের শেষ পরিণামের কথা। এদের মুক্তির জন্যে কাতর হয় প্রভুর মন।

রাত্রির তৃতীয় যামে জগতের স্বরূপ উপলব্ধি করলেন তপস্বী। তিনি

বুঝতে পারলেন অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশ হলেই সমস্ত দুঃখ ও আসক্তি দূর হবে। পরিপূর্ণ মুক্তি আসবে জীবের জীবনে।

এইভাবে সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি বুদ্ধ [জ্ঞানী] নামে পরিচিতি হলেন। রাত্রির চতুর্থ প্রহরে বিশ্বচরাচর যখন শান্ত তখন সেই ঋষি তথাগত [যিনি পরম জ্ঞানীদের পথে গমন করেছেন] সর্বজ্ঞতা লাভ করলেন।

পরপর সাতদিন নিষ্পলক নেত্রে বসে রইলেন মৌনী তাপস। তারপর পৃথিবীর মানুষের মুক্তির কথা ভেবে উঠে দাঁড়ালেন।

নবোদিত সূর্যের মতো মহাজ্ঞানী বুদ্ধ তখন তাঁর মহান ব্রতে উদ্যোগী হয়ে পবিত্র বারাণসী নগরে প্রবেশ করলেন।

পঞ্চরাত্র ॥ ভাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

গল্পটা মহাভারতের। কিন্তু মহাকবি ভাস তাকে কিছুটা বদলে দিয়েছেন। তাই বলে কি তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে? মোটেও না। যুগ-যুগ ধরে মহাভারতের মূল গল্পগুলো এমনি করেই অদল-বদল করে তো কত মহা-মহা লেখক, কবি আর নাট্যকার অমর শিল্প সৃষ্টি করেছেন। মহাভারত এক সোনার খনি। সেই খনির সোনা তুলে এনে এ যেন কত সুন্দর-সুন্দর অলঙ্কার আর হরেক জিনিস বানানো। হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে হয়।

'পঞ্চরাত্রে' সেই সময়কার কথা, যখন পাণ্ডবরা পাশা খেলায় হেরে বারো বছর বনবাসের পর অজ্ঞাতবাসে কাটাচ্ছেন।

অজ্ঞাতবাসে থাকার সময় বিপদটা এই যে, যদি কেউ ওঁদের চিনতে পারে, ফের বারো বছর বনে গিয়ে কাটাতে হবে। আর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারবে না। তাই পাণ্ডবরা কি না ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। দুর্যোধন চর পাঠিয়ে ওঁদের খুঁজে বের করার জন্যে হন্যে হয়েছেন। শেষমেশ ভেবেছেন, পাঁচভাই বুঝি বন-জঙ্গলে বেঘোরে মারাই পড়েছেন। অতএব তিনি নিশ্চিন্ত। মনের সুখে রাজ্য ভোগ করতে পারবেন। কেউ আর আদ্ধেক ভাগ চাইতে আসবে না।

এই সুখেই কুরুরাজ দুর্যোধন বিরাট এক যজ্ঞ করলেন একদিন।

সেই যজ্ঞে দেশবিদেশের ছোট বড় সব রাজার নেমন্তন্ন। রাজ্যের সব ব্রাহ্মণও এসে হাজির হলেন। তাঁরা ছাড়া যজ্ঞ হবে কেমন করে?



নদীর ধারে যজ্ঞ তো ভালয়-ভালয় হয়ে গেল। অসংখ্য গাড়ি বোঝায় করে মণ-মণ ঘি আনা হয়েছিল বড়-বড় পাত্রে ভরে। যজ্ঞে উৎসর্গ করা হলো। ব্রাহ্মণরা পেট পুরে খেলেন আর প্রচুর দক্ষিণা নিয়ে দুর্যোধনের জয়গান করতে করতে বিদায় নিলেন।

তিনজন ব্রাহ্মণ বুঝি আরও কিছু দান-দক্ষিণার আশায় তখনও চলে যান নি। নদীর ধারে যজ্ঞের জায়গায় ঘুরঘুর করছিলেন।

যজ্ঞের জায়গাটা তখন ব্রাহ্মণভোজনের উচ্ছিষ্টে একাকার। যত খেয়েছেন, তত ছড়িয়েছেন চারপাশে। তিন ব্রাহ্মণ তাই দেখছেন, আর রাজা দুর্যোধনের সুখ্যাতিতে আহা আহা করছেন। ঘি পোড়ানো আগুন তখনও নিভে যায় নি। বাতাসে পোড়া গন্ধ ভাসছে। তিন ব্রাহ্মণ মনের সুখে গল্পগুজব করছেন।

যজ্ঞ শেষ হলে যিনি যজ্ঞ করেছেন, তাঁকে স্নান করতে হবে। তাকে বলে 'অবভৃত' স্নান। রাজা দুর্যোধন এবার সেই যজ্ঞীয় স্নানের জন্য আসবেন।

হেন সময় কয়েকজন চপলমতি বালক সেখানে এসে জুটল। তারা করল কী, যজ্ঞের আগুন নিয়ে খেলতে শুরু করল। এপাশে-ওপাশে ছড়িয়ে ফেলল অঙ্গারের টুকরো। অমনি কুশবন আর গাছপালায় আগুন ধরে গেল। তিন ব্রাহ্মণ হাঁ হাঁ করে উঠলেন। তেড়েমেরে বললেন—আরে, আরে! করছ কী তোমরা? অবভৃত স্নান এখনও হয়নি, আর তোমরা অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দিলে যে!

ওরা শুনলে তো? তিনজনে গোমড়ামুখে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলেন। ঘিয়ের গাড়িগুলোতে আগুন ধরে গেছে। কাঁচা কুশঘাস প্রচণ্ড ধোঁয়াচ্ছে। যে-সব গাছের গায়ে শুকনো লতাপাতা ছিল, তারা জ্যান্ত পুড়ে মরছে। একটা উইঢিবির গায়ে আঁচ লাগতেই ছটফট করে বেরিয়ে পড়ল পাঁচটা সাপ এবং প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। আগুন ক্রমশ ছড়াতে থাকল জঙ্গলে।

এই সর্বনেশে ব্যাপারে ব্রাহ্মণরা আর কী করবেন, তাঁরা অগত্যা

এই অগ্নিকাণ্ডের প্রত্যেকটি দিক খুঁটিয়ে দেখেন আর শাস্ত্রজ্ঞান আওড়ান। কাব্য করেন। একজন বললেন—ওই পাঁচটা সাপ কীভাবে পালাল দেখছ তো? মানুষ মরলে ঠিক এইভাবেই পাঁচটা ইন্দ্রিয় শরীর থেকে বেরিয়ে পালায়! আরেকজন বললেন—দেখছ? একটা শুকনো গাছে আগুন ধরে জঙ্গলের সব সবুজ গাছ পুড়ে মরছে! সমাজে একজন বদমাশ লোক থাকলে তারই দোষে সবাইকে এমনি করে ভুগতে হয়। তৃতীয়জন বললেন—ওই দেখ, কলাবনে আগুন ঢুকে পড়েছে, আর কলাগুলো মাটিতে পড়ছে—যেন পাকা ফল! আর ওই দেখ তালগাছটার অবস্থা। তার মাথায় ছিল মৌমাছির চাক। সর্বনাশ! তালগাছটাও পড়ে গেল!

তিন ব্রাহ্মণ ভয়ে কাঠ। কিন্তু শেষপর্যন্ত আগুন নিভে গেল। আশেপাশে আর কিছু পোড়ার নেই। তখন ওঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। চোখেমুখে জল ছিটিয়ে হাত-পা ধুয়ে নিলেন।

এতক্ষণে কুরুরাজ দুর্যোধন এলেন সদলবলে অবভৃত স্নানে। তিন ব্রাহ্মণ হয়তো আরও কিছু দান-দক্ষিণার আশায় এমন অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাজার অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু মুখে তো আর সেটা বলা যায় না। তাই রাজাকে আশীর্বাদ করে 'জয় হোক' বলে কেটে পড়লেন।

দুর্যোধনের সঙ্গে এসেছেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শকুনি প্রমুখ। সবাই দুর্যোধনের যজ্ঞের সুখ্যাতি করলেন। দ্রোণ হলেন কুরুপাণ্ডব সবপক্ষের অস্ত্রগুরু। এখন কুরুপক্ষে আছেন। তিনি দুর্যোধনের গুরু। যজ্ঞ করলে গুরুকে দক্ষিণা দিতে হয়। তাই দুর্যোধন বললেন—আচার্য! এবার তাহলে আমার দক্ষিণা গ্রহণ করুন।

দ্রোণের মনে পাণ্ডবদের জন্যও গভীর স্নেহ রয়েছে। দক্ষিণার কথা বলতে তাঁর চোখে জল এসে গেল। আহা, পাণ্ডবরা বারো বছর বনে-জঙ্গলে কষ্ট পেয়ে ঘুরে কোথায় অজ্ঞাতবাসে দুর্ভোগ ভুগে মরছে কে জানে! সেকথা ভেবেই তিনি বললেন—বৎস দুর্যোধন! আমাকে

যদি দক্ষিণা দাও, তাহলে বলি—নিরাশ্রয় হতভাগ্য পাণ্ডবদের তুমি রাজ্যের ভাগ দাও। তাহলেই আমাকে দক্ষিণা দেওয়া হবে।

কূটবুদ্ধি শকুনি প্রমাদ গণলেন। রেগে গিয়ে বললেন—বাঃ! আপনি তো ভারি চালাক লোক মশাই! শিষ্যকে ফাঁদে ফেলে কাজ আদায় করে নিচ্ছেন দেখছি! একে বলে ধর্মের নামে প্রতারণা!

দ্রোণের সঙ্গে তাঁর তর্ক বেধে গেল। ভীষ্ম আপসে সব বুঝিয়ে মিটমাট করতে চাইলেন। দুর্যোধনকে যদি বা নোয়ানো যায়, তাঁর মামা গান্ধাররাজ শকুনি গোলমাল বাধান। দুর্যোধন তাঁর এই মামার বশ। গতিক বুঝে ভীষ্ম দ্রোণকে ইশারায় বললেন—শকুনির সঙ্গে মিষ্ট কথায় ভাব করে নিন। তখন দ্রোণ শকুনির সঙ্গে তর্ক না করে মিষ্ট কথায় তাকে তুষ্ট করতে চাইলেন।

এতে কাজ হলো। শকুনি বললেন—ভাল কথা। পাণ্ডবদের রাজ্য ফিরিয়ে দিক দুর্যোধন। তাতে আমার আপত্তি নেই। তবে একটা শর্ত।

সবাই চমকে উঠলেন। শকুনির বুদ্ধি ভারি প্যাঁচালো। দ্রোণ বলে উঠলেন—কী শর্ত শকুনি?

শকুনি ক্রূর হেসে বললেন—যদি পাঁচ রাতের মধ্যে আপনি পাণ্ডবদের খবর আনতে পারেন, তাহলে ভাগ্নেবাবাজী ওঁদের আদ্ধেক রাজ্য দেবেন। তাতে আপনার প্রাপ্য দক্ষিণাও উসুল হবে। কেমন?

দ্রোণ হতাশ হয়ে বললেন—তোমরা হাজারটা গুপ্তচর পাঠিয়ে এতকাল যাদের খবর আনতে পারনি, আমি তাদের খবর আনব মাত্র পাঁচটা রাতের মধ্যে! এ কি সম্ভব?

শকুনির গোঁ-ধরা ভাব যেমন, তেমন দুর্যোধনেরও। দুর্যোধন সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ গুরুদেব। যদি পাঁচ রাতের মধ্যে পাণ্ডবদের খবর এনে দেন, তাহলে আমি অর্ধেক রাজ্য দিতে রাজি।

এই সময় বিরাটনগর থেকে এক দূত এসে হাজির।

এই যজ্ঞে দুর্যোধন সব রাজাকেই নেমন্তন্ন করেছিলেন। সবাই

এসেছেন। শুধু আসেননি রাজা বিরাট। দুর্যোধন তাই মনে মনে চটে গিয়েছিলেন।

এতক্ষণে বিরাটরাজার দূত এসে জানাল, রাজা বিরাট আসতে পারেন নি। কারণ তাঁর মন ভাল নেই। খুব শোক পেয়েছেন।

—কেন? শোক পেয়েছেন কেন?

—তাঁর সম্বন্ধী কীচকরা একশোভাই গতরাতে রাজবাড়িতে খুন হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, তাঁদের গায়ে অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন নেই। মনে হয় যেন কেউ শুধু হাতের আঘাতেই তাঁদের মেরে ফেলেছেন।

শোনামাত্র ভীষ্ম টের পেলেন, এ কাজ আর কারও নয়, স্বয়ং ভীমের। তাহলে বোঝা যাচ্ছে পাণ্ডবরা বিরাটের রাজ্যেই লুকিয়ে আছেন। দুষ্ট কীচকরা নিশ্চয় কোনোও কুকীর্তির সাজা পেয়েছে।

ভীষ্ম আড়ালে ডেকে দ্রোণকে কথাটা চুপিচুপি জানিয়ে দিলেন। তখন দ্রোণ দুর্যোধনের কাছে গিয়ে বললেন—বৎস দুর্যোধন! তোমার মামার শর্তেই আমি রাজী। পাঁচ রাতের মধ্যে তোমাকে পাণ্ডবদের খবর এনে দেব।

এদিকে দুর্যোধন তো বিরাটরাজ না আসার জন্য চটে আছেন। সম্বন্ধীদের খুনখারাপি হয়েছে যজ্ঞে আসবেন না, এটা কি একটা কথা হলো? যার তার যজ্ঞ নয়, কুরুপতি দুর্যোধন বলে কথা! এ আসলে অপমান করা।

ভীষ্ম এই সুযোগে দুর্যোধনকে আরও খুঁচিয়ে দিয়ে বললেন—বিরাট তোমার যজ্ঞকে সম্মান দেখাতে আসেন নি। এতে তোমার অপমান হয়েছে, দুর্যোধন। তুমি ওর গোরুর পাল লুঠ করে নিয়ে এস। দেখবে, বাছাধন জব্দ হয়ে যাবে। ধনসম্পদ বলতে তো ওর শুধু গরুর পাল! অতএব সৈন্য সাজাও। এ অপমানের প্রতিশোধ নাও। আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

দুর্যোধন ও শকুনি—ভাগ্নে ও মামা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ওঁরা তো টের পাচ্ছেন না, ভীষ্ম ও দ্রোণের উদ্দেশ্য কী।

সাজসাজ রব পড়ে গেল। হাতি ঘোড়া রথ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কৌরবরা চলল বিরাটের গরু লুঠ করতে। সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ সবাই চললেন। শকুনি চললেন হাতির পিঠে সবার আগে।···

সেদিন রাজা বিরাটের জন্মদিন। রাজ্যে বড় ধুম পড়ে গেছে। রাজার গরুর পালের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যারা করে, তারাও সেজেগুজে উৎসবে যোগ দিয়েছে। রাখাল ছেলেরাও সেজেগুজে ভাল খাওয়াদাওয়া করে হইচই করে বেড়াচ্ছে। নাচছে, গাইছে।

হেন সময়ে হঠাৎ রাখাল ছেলেরা অবাক হয়ে দেখল, ধুলোয়-ধুলোয় আকাশ ধূসর করে কারা ঢাকঢোল বাজিয়ে এবং তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে আসছে।

তারপর দেখা গেল, রথের মাথায় সাদা ছাতা রয়েছে। দলেদলে ওরা গরুর পালের মধ্যে ঢুকে গরু লুঠ করতে শুরু করেছে। ওরে বাবা! এরা যে দেখছি গরুচোর!

রাখালরা দৌড়ে এসে বৃদ্ধ গোপালককে সেই খবর দিল। গোপালক ব্যাপারটা দেখে ভয়ে সারা। হাজার হাজার তীর এসে পড়ছে চারপাশে। সে রাখালছেলেদের আড়ালে লুকোতে বলে রাজাকে খবর দিতে দৌড়ুল। এ গরুচোরদের দল নেহাৎ ছিঁচকে নয়, রীতিমতো লুঠেরা ডাকাত।

রাজা বিরাট তখন জন্মরাত্রির উপোস করে নক্ষত্রপুজোয় বসেছেন। খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তারপরই দূতের মুখে জানলেন, ওরা আর কেউ না, কুরুরা। স্বয়ং কুরুরাজ দুর্যোধন তাঁর গো-ধন লুঠতে এসেছেন।

কিন্তু বিরাট ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধে ভয় পায় না। তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সেজে হুকুম দিলেন তাঁর রথ আনতে। ক্ষত্রিয় হয়ে যদি পাল্টা যুদ্ধ না করেন, সমাজে মুখ দেখাতে পারবেন না যে!

কিন্তু রথের সারথি ভয়ে ভয়ে এসে বলল—মহারাজ! আপনার রথ নেই।

বিরাট অবাক হয়ে বললেন—রথ নেই মানে?

—আজ্ঞে মহারাজ, আপনার রথটা নিয়ে আপনার পুত্র যুবরাজ উত্তর গেছেন কুরুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

বিরাট হতবাক হয়ে গেলেন। উত্তর কোন সাহসে ওদের সঙ্গে লড়তে গেল, ভেবেই পেলেন না। কুরুপক্ষে বড় বড় সব বীর এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে উত্তর লড়তে গেল! আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন বিরাট।

এদিকে হয়েছে কী, পাণ্ডবরা পাঁচ ভাই আর দ্রৌপদী ছদ্মবেশে রাজা বিরাটের প্রাসাদে আশ্রয় নিয়ে আছেন। কেউ তাঁদের পরিচয় টের পায় নি। যুধিষ্ঠির নাম নিয়েছেন ভগবান। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং পাশাখেলায় পারদর্শী এই ভগবান। ভীম হয়েছেন রাজার ভোজনশালার কর্তা। নাম নিয়েছেন ভীমসেন। অর্জুন ভারি অদ্ভুদ ছদ্মবেশ ধরেছেন। নপুংসক তিনি। স্ত্রীলোকবেশী পুরুষ। নাম বৃহন্নলা। নাচগানের মাস্টারী করেন রাজার অন্তঃপুরে। নকুল আর সহদেব গোবদ্যি আর ঘোড়াবদ্যি সেজে আছেন। আর দ্রৌপদী হয়েছেন সৈরিন্ধ্রী। রাজবাড়ির মেয়েদের চুলের খোঁপা করে এবং সাজিয়ে গুজিয়ে দেন। আজকাল যাকে বলে হেয়ার স্টাইল করা। বিউটি পার্লার নামে দোকান খুলে একালে সেই কাজটাই করা হয়। সৈরিন্ধ্রী আসলে হেয়ারড্রেসার।

অর্জুন তাঁদের পাঁচভাইয়ের তীরধনুক লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন একটা গাছের ওপরে। একটা পচা ভুটভুটে মড়া গাছে তুলে রেখেছিলেন—যাতে গাছটার আনাচে কানাচে কেউ না যায়। এক দুর্গন্ধ, তাতে আবার মড়ার ভূতের ভয়। কেউ ওদিকে পা বাড়াবে না। ফলে অস্ত্রগুলো চুরি হবে না।

কুরুরা গরু লুঠতে হামলা করলে বৃহন্নলারূপী অর্জুন চুপ করে থাকতে পারেন নি। রাজপুত্র উত্তরকে তাঁর বাবার রথ আনতে

ফুঁসলেছিলেন। উত্তর অবাক হয়েছিলেন। না-মেয়ে, না-পুরুষ এই বৃহন্নলার কাণ্ড দেখে সে হতভম্ব। গাছের ওপরকার মড়া সরিয়ে সে বৃহন্নলার কথামতো তীর ধনুক নামিয়ে এনেছে। তারপর আর কী! কুরুদের ওপর পাল্টা হামলায় কুরুরা তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত। লুঠকরা গরুর পাল ফেলে রেখে কেটে পড়ার তালে। অর্জুনের ধনুকের নাম গাণ্ডীব। তার টংকারের শব্দেই ওদের অনেকের কানে তালা ধরে গেছে। উত্তর রথ চালাচ্ছে আর বৃহন্নলা ঝাঁকে ঝাকে তীর ছুঁড়ছে।

এসব খবর পেয়ে রাজা বিরাট আরও অবাক হলেন। কিছুক্ষণ পরে ফের খবর এল, অর্জুনের ছেলে অভিমন্যু ধরা পড়েছে।

বিরাট তো পাণ্ডবদের চেনেন না তখনও। তাই এ খবরে আকাশ থেকে পড়লেন যেন। অভিমন্যু কৃষ্ণের ভাগ্নে। তাঁর কাছেই ছিল। পরে কুরুপক্ষে যোগ দেয়। সেও এসেছিল দুর্যোধনের সঙ্গে গরু লুঠতে। কিন্তু সে তো মস্ত বীর। তাকে খালিহাতে বন্দী করা মানুষের দুঃসাধ্য। তাহলে তাকে ধরে আনল কে এবং কেমন করেই বা ধরল?

বিরাট একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

শেষে জানা গেল, ভীমসেন তাকে ধরে এনেছেন। কী ভাবে? না—

পিতা অর্জুন একদা অভিমন্যুকে বলেছিলেন—বাছা অভিমন্যু। আমার এই কথাটা তুমি মনে রাখবে এবং পালন করবে। শত্রু যদি নিরস্ত্র অবস্থায় তোমার মুখোমুখি দাঁড়ায়, তুমি কক্ষনো আর অস্ত্র হাতে রাখবে না। অস্ত্র ছেড়ে তুমিও নিরস্ত্র হবে। এটাই ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠদের এক পরম গুণ।

অভিমন্যু বাবার এই কথা মেনে চলত।

এদিকে ভীম সেটা জানেন। তাই নিরস্ত্র অবস্থায় ভাইপোর সামনে গেছেন এবং নিরস্ত্র ভাইপোটিকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে

এসেছেন রথ থেকে। গায়ের জোরে অভিমন্যু খুড়োকে পারবে কেন? কুরুরা তো পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। এবার বন্দী অভিমন্যুকে বিরাটের সামনে আনা হলো। অভিমন্যু কিন্তু ছদ্মবেশধারী বাবা-জ্যাঠা-খুড়োদের চিনতে পারলেন না। তাঁরা যখন তাকে স্নেহে ও আদরে তুমি-টুমি করছেন, তখন সে রেগে আগুন। কে এই আজেবাজে লোকগুলো তার মতো বীর, বিশেষ করে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের ছেলেকে এমন গায়েপড়া ভাব দেখাচ্ছে আর তুমিটুমি করছে? এদের স্পর্ধা তো কম নয়! সে চটে গেল প্রচণ্ড।

সেই সময় রাজপুত্র উত্তর এল।

এসে হাসতে হাসতে পাণ্ডবদের পরিচয় ফাঁস করে দিল। অভিমন্যু চমকে উঠেছিল। এবার একে একে পিতৃব্য ও পিতার পায়ের ধুলো নিল মাথায়। কতকাল পরে পিতাপুত্রের মিলন হলো। রাজা বিরাটের রাজধানী বিরাটনগরে আবার উৎসব শুরু হলো।

রাজা বিরাট এবার অর্জুনকে বললেন—বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন! আপনি আমার গোধন রক্ষা করেছেন। তারই বিজয়পণ হিসেবে আমার কন্যা উত্তরাকে আপনার হাতে সমর্পণ করতে চাই।

অর্জুন জিভ কেটে বললেন—সে কি কথা! আমি আপনার প্রাসাদের সকল স্ত্রীলোককে মা বলে ডেকেছি। এতএব উত্তরার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। বরং আমার ছেলে অভিমন্যুর জন্য তাকে গ্রহণ করতে পারি।

এতে সবাই সায় দিলেন। রাজ্যে ধুম পড়ে গেল আরও। অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে হবে। উৎসব দ্বিগুণ হলো। বিয়ের নেমন্তন্নে লোক ছুটল নানা রাজ্যে।

রাজা বিরাট ভীষ্মকে এ বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে রাজপুত্র উত্তরকে পাঠালেন হস্তিনাপুরে।

তখন কুরুদের মনমরা অবস্থা। এত বড় সব বীর থাকতে যুদ্ধে

হটে পালিয়ে আসতে তো হলোই, অভিমন্যু বেচারা বন্দী হয়ে রইল বিরাটনগরে। ছ্যা! ছ্যা! মুখ দেখানো দায় হলো যে!

দুর্যোধন কর্ণ শকুনি আর দ্রোণ ভীষ্ম প্রমুখ সেই নিয়ে আলোচনা করছেন। সবাই কিন্তু বেজায় অবাক হয়েছেন। নপুংসক বৃহন্নলার পরাক্রম দেখে তাক লেগে গেছে। অমন করে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ে কুরুসৈন্যদের ঘায়েল করে ফেলল সে।

কে ওই বৃহন্নলা?

আর রথ থেকে অভিমন্যুকে একটা লোক ধরে নিয়ে গেল কীভাবে, তাও সবাই দেখেছেন। দেখে জল্পনাকল্পনা হচ্ছে। এমন শক্তিমান পালোয়ান কে হতে পারে?

এমন সময় এক সারথি এল। তার হাতে একটা তীর। সে বলল—মহামতি ভীষ্মের রথের মাথায় এই তীরটা বিঁধেছিল। তীরে কী যেন লেখা আছে, দেখুন তো?

ভীষ্ম সব টের পেয়েছেন কত আগেই। কিন্তু ভান করে বললেন—আমি বুড়োমানুষ। চোখের নজর কমে গেছে। ওহে শকুনি! তোমার নজর খুব তীক্ষ্ণ। দেখ তো বাপু, তীরে কী লেখা আছে।

শকুনি তীরটা নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দ্রোণের পায়ের কাছে। মুখ চূণ করে শুধু বললেন—হুঃ! এ তীরে দেখছি অর্জুনের নাম লেখা আছে।

দ্রোণ লাফিয়ে উঠে তীরটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন—এবার? এবার তাহলে পাণ্ডবদের খবর পাওয়া গেল। বাছা দুর্যোধন! তাহলে আমার দক্ষিণা দাও। পাণ্ডবদের অর্ধেক রাজ্য দিতে তুমি প্রতিশ্রুত।

শকুনি ভাঙে তো মচকায় না। গোঁ ধরে বললেন—হুঃ! ভারি তো একটা তীর। শুধু ওই তীর দিয়ে কিছু প্রমাণ হয় না। অর্জুন কি আর ভূভারতে থাকতে নেই? শুধু পাণ্ডবদেরই অর্জুন আছে? এ অন্য অর্জুন।

দুর্যোধন মামার কথায় সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ। চোখে না

দেখলে মানব কেমন করে? যদি যুধিষ্ঠিরের দেখা পাই, তাহলে নিশ্চয় আমার কথা রাখব।

হেন সময়ে খবর এল, বিরাটরাজের দূত এসেছে দেখা করতে কুরুরাজের সঙ্গে।

দূত স্বয়ং রাজপুত্র উত্তর।

উত্তর এসে সহাস্যে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে বলল—বিরাটনগর থেকে হস্তিনাপুরের দূরত্ব তেমন কিছু বেশি নয়। অথচ পৌঁছতে বড্ড দেরী হয়ে গেল। কারণ কি জানেন? অর্জুনের তীরের আঘাতে আপনাদের অজস্র হাতি মারা পড়েছে। সেগুলো রাস্তা আটকে পড়ে আছে। কী কষ্টে সব রাস্তা থেকে সরিয়ে তবে না আমার রথ চালানো গেল। বাপ্‌স্, সে এক ভীমের খাটুনি!

কুরুরা অবাক। তাহলে সত্যিসত্যি অর্জুন তাদের ভাগিয়ে দিয়েছে? তবু তাঁরা মুখে একথা স্বীকার করতে নারাজ।

দ্রোণ বললেন—যাক্ গে। বিরাটরাজের খবর কি বল বাবা উত্তর?

উত্তর বলল—বিরাটরাজ আমায় পাঠান নি আচার্য!

—তবে কে পাঠাল তোমায়?

উত্তর মুচকি হেসে বলল—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পাঠিয়েছেন। আমার বোন উত্তরার সঙ্গে তাঁর ভাইপো অভিমন্যুর বিয়ে কি না। সেই বিয়েতে আপনাদের নেমন্তন্ন।

হইচই পড়ে গেল। দ্রোণ বললেন—বৎস দুর্যোধন! এবার তাহলে দক্ষিণা দাও। পাঁচ রাতের মধ্যে সবে একটা রাত গেছে। তারই মধ্যে পাণ্ডবদের খবর এল। শুধু তাই নয়, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের দূত এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিয়ে।

কথা কেড়ে উত্তর ফের হেসে বলল—বিয়েটা হস্তিনাপুরে হবে, নাকি বিরাটনগরে?

শকুনি গোমড়া মুখে বললেন—না হে বাপু! ওসব বিয়ে-টিয়ের

ঝামেলা এখানে নয়। ও তোমাদের বিরাটনগরেই হোক। গণ্ডগোল আমার বরদাস্ত হয় না।

দুর্যোধন অগত্যা আর কী করেন, গুরুদেব দ্রোণাচার্যকে দক্ষিণা তো দিতেই হবে। বললেন—ঠিক আছে। যে সত্য করেছি, তা পালন করা ছাড়া উপায় কী? গুরুদেব, তাই হবে। অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবদের দান করলুম!...

ব্যস, কুরুপাণ্ডবের বিবাদ মিটমাট হয়ে গেল। দুপক্ষ আধাআধি রাজ্য ভাগ করে নিয়ে মনের সুখে রাজত্ব করতে থাকলেন।

কিন্তু আঠারো দিনের যুদ্ধ? মহাভারতের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কোথায় গেল?

মহাভারতের যুদ্ধ মহাভারতেই আছে। মহাকবি ভাসের 'পঞ্চরাত্র' অন্য গল্প। সেই যে সোনার খনি থেকে আনা সোনার অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে গোড়ায়—'পঞ্চরাত্র' সেই সুন্দর অলঙ্কার।

যুদ্ধ নয়, শান্তিই জীবনের সার কথা। ভাস সেই কথাটাই বলেছেন তাঁর 'পঞ্চরাত্র' নাটকে। আপসে বিবাদ মিটিয়ে শান্তিতে পাশাপাশি বাস করার কথা বলেছেন।

আজকের ভারত সেই নীতি মেনেই চলেছে। ভাসের অমরত্ব আর শ্রেষ্ঠতা তাঁর লেখা কাহিনীকে ছাড়িয়ে এই পরম সত্যের নীতিতেই উদ্ভাসিত রয়েছে। এখানেই তাঁর জয়।

প্রতিমা নাটক ॥ ভাস

মূল নাটক ঃ ভাস/গল্পরূপ ঃ কাহিনী রূপায়ণ ঃ

মিহির সেন

অযোধ্যার অধিপতি রাজা দশরথ স্থির করেছেন, জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে অবসর নেবেন। বানপ্রস্থে যাবেন। অভিষেকের দিনক্ষণ স্থির। আয়োজনও সম্পূর্ণ। শুভদিনে শুরু হলো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। অভিষেক বেদীতে অধিষ্ঠিত হলেন ঋষি বশিষ্ঠ। মঙ্গলাসনে গিয়ে বসলেন রাম। শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ মঙ্গলঘট ধরে দাঁড়ালেন। মহারাজ ধরে রইলেন রাজছত্র। গোটা নগরই যেন আজ আমন্ত্রিত অতিথি।

অভিষেক শুরু হতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল মন্থরা। মহারাজের কানে কানে কি যেন বলল। মহারাজ অভিষেকের কাজ স্থগিত রেখে, রামকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে বলে, অন্দর-মহলের দিকে গেলেন।

সীতা এসব কিছু জানতেন না। সখীদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে সংগীতশালায় এসেছিলেন তিনি। এসে দেখেন, এক নিভৃত জায়গায় দাঁড়িয়ে এক সখী একটি বল্কল নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে। সীতা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোর হাতে বল্কল কেন? এ বল্কল কার?

সখী হেসে বলল, এই রঙ্গশালার। সাজঘর থেকে গোপনে নিয়ে এসেছি, এটি পড়লে আমাকে কেমন মানায়, দেখবার জন্য।

শুনে কৌতুক বোধ করেন সীতা। বলেন, দেখি, দেখি, এটি পরলে আমাকে কেমন মানায় ?

সীতা বল্কল পরলেন। সখীরা দেখে মুগ্ধ।—অপূর্ব লাগছে আপনাকে। মনে হচ্ছে, আপনার রূপের ছোঁয়ায় বল্কল যেন সোনা হয়ে গেছে !

এমন সময় নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য একবার বেজে উঠেই থেমে গেল। সীতা বললেন, হঠাৎ মঙ্গলবাদ্য কেন ?

একজন সখী প্রবেশ করে সংবাদ দিল, এইমাত্র শুনে এলাম, আজ নাকি জ্যেষ্ঠ কুমারের অভিষেক হচ্ছে। ও মঙ্গলবাদ্য নিশ্চয় তারই।

সীতা বললেন, কিন্তু একবার বেজেই থেমে গেল কেন ? মঙ্গল-কাজে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি তো ?

প্রশ্ন করেই সীতা দেখেন, শ্রীরামচন্দ্র এদিকেই আসছেন। তাঁকে দেখে এগিয়ে গেলেন সীতা। জিজ্ঞেস করলেন, একি, আর্যপুত্র এখানে ? আপনার শুনলাম আজ অভিষেক ?

রাম বললেন, ঠিকই শুনেছিলে, সীতা ! কিন্তু অভিষেক শুরু হবার মুখেই মন্থরা এসে পিতাকে ডেকে নিয়ে গেল। সাময়িকভাবে অভিষেক তাই স্থগিত রইল ! এতে আমি আনন্দিতই হয়েছি, সীতা।

একটু অবাক হয়ে সীতা বলেন, কেন ?

রাম হেসে বললেন, এতে মহারাজ মহারাজই রইলেন, আর আমি যে রাম সেই রামই রইলাম। পিতার বর্তমানে রাজ্যভার গ্রহণে আমি ইচ্ছুক ছিলাম না, সীতা।

সীতাও শুনে খুশি হন।

এতক্ষণে রামের দৃষ্টি পড়ে সীতার পোষাকের দিকে। সামান্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, একি, তোমার পরনে বল্কল কেন, সীতা ?

উত্তর দেয় একসখী, পরলে মানায় কিনা দেখার জন্যই কৌতুক করে ঐ বল্কল পরেছেন উনি।

রাম বললেন, ইক্ষ্বাকু বংশে বার্ধক্যের যা অলঙ্কার তাই পরেছ তুমি,



সীতা। আমারও ভাল লাগে ঐ বল্কল। আমিও একটি বল্কল আনিয়ে নিচ্ছি।

শুনে একটু যেন চমকালেন সীতা। বললেন, না না, অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনবেন না। বার্ধক্যের, বৈরাগ্যের পোষাক আপনি কেন পরবেন ? অভিষেক হতে গিয়ে স্থগিত রইল, এতেই অমঙ্গলের ভয় পাচ্ছি আমি।

রাম হেসে বললেন, অনর্থক দুঃখ-শোকের আশঙ্কা করছ, সীতা। বিশেষ করে এ যখন শুধুই এক কৌতুকের ব্যাপার। তাছাড়া আমার অর্ধাঙ্গ তুমি তো আগেই পরে বসে আছ এ পোষাক।

বাইরে হঠাৎ বহু কণ্ঠের কলরব শোনা গেল। উত্তেজিতভাবে ভেতরে এসে প্রবেশ করলেন প্রবীণ পারদর্শী এক রাজকর্মচারী।

—মহারাজকে রক্ষা করুন, কুমার।

রাম অবাক হয়ে বললেন, কেন, কি হয়েছে পিতার ? কোনো বিপদ ঘটেছে ?

প্রবীণ বললেন, বিপদই বলতে পারেন। প্রচণ্ড এক আঘাতে মহারাজ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

—আঘাত ? কে আঘাত করেছে পিতাকে ?

—রানী কৈকেয়ী।

বিশ্বাস করতে পারেন না রাম। বলেন, অসম্ভব! ইন্দ্রতুল্য যাঁর স্বামী, আমি যাঁর পুত্র, কোন ফলের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এমন অন্যায় করবেন ?

প্রবীণ অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, কুমার, আপনার সরল মন, তাই স্বভাব-কুটিল স্ত্রীবুদ্ধির বিচার আপনি করতে পারবেন না। রানী কৈকেয়ীর জন্যই বন্ধ হয়েছে আপনার অভিষেক। শুধু তাই নয়, নিজ পুত্র ভরতকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করারও দাবি জানিয়েছেন তিনি। এরপরও বলবেন, তিনি নিঃস্বার্থ ? নির্লোভ ?

রাম বললেন, তাতেও কোনো অন্যায় দেখি না আমি। মহারাজ

মাতা কৈকেয়ীকে তিনটি বরদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন বলে শুনেছি। তার এক বরে নিজপুত্রের জন্য যদি রাজ্য তিনি চেয়েই থাকেন, তাতেই বা অপরাধ কি ? যাই হোক, আমার মা'র কোনো নিন্দা শুনতে আমি প্রস্তুত নই, এবার পিতার সংবাদ দিন।

ক্ষুব্ধ স্বরে প্রবীণ বলেন, আর এক বরে আপনার চৌদ্দ বৎসর বনবাসের দাবি জানিয়েছেন রানী। সেই প্রার্থনা শোনামাত্র শোকে নির্বাক মহারাজ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন।

তাঁর কথা শেষ না হতেই ক্রোধে উন্মত্ত লক্ষ্মণ বেগে রঙ্গশালায় প্রবেশ করেন। হাতে তার ধনুর্বাণ। চীৎকার করে রামকে বললেন, না না, এর কোনো ক্ষমা নেই। আমাদের জননী হলেও এর শাস্তি পেতে হবে তাঁকে। আপনি যদি না পারেন, আমাকে ছেড়ে দিন। তাঁকে নিজ হাতে শাস্তি দেব আমি। স্বার্থান্ধ এক যুবতী নারীর অপরাধে পিতার এই নিগ্রহ, আমাদের রাজ্যচ্যুতি—তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, পৃথিবীকে যুবতীহীন করে ছাড়ব আমি।

রাম শান্ত করার চেষ্টা করেন লক্ষ্মণকে। বলেন, আমার রাজ্যচ্যুতিতে তোমার এমন ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নয়, লক্ষ্মণ। ভরত রাজা হোক বা আমিই রাজা হই, সে তো একই কথা। তোমার যদি ধনুর্বিদ্যায় সত্যি অহঙ্কার থাকে তাহলে রাজা ভরতকে রক্ষার দায়িত্বই গ্রহণ কর, বরং।

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেন লক্ষ্মণ। বলেন, আপনার রাজ্যচ্যুতির জন্য আদৌ দুঃখ করছি না আমি। আপনার চোদ্দ বছরের জন্য বনে যেতে হবে, তাতেই আমি বিচলিত বোধ করছি, আর্য।

রাম প্রশান্ত স্বরে বলেন, এতে তোমার বিচলিত বোধ করা উচিত নয়, লক্ষ্মণ। আমার পূর্বতন রাজারা যে ধর্ম পালন করার সুযোগ পান নি, আমি সেই ধর্ম পালনের সুযোগ পাচ্ছি, এ কম সৌভাগ্যের কথা ?

তারপর সীতার দিকে তাকিয়ে বললেন, সীতা, আমাকে বল্কল দাও।

নিঃশব্দে বল্কল এগিয়ে দিলেন সীতা।

সবাই সীতার ধৈর্য দেখে অবাক!

রাম বললেন, আমি বনবাসে যাচ্ছি, সীতা।

সীতা শান্ত স্বরে বললেন, আমি আপনার সহধর্মিণী, তাই আমিও আপনার সহগামিনী হব।

রাম বোঝান, তা কি করে হয়? তুমি কি করে অরণ্যে বাস করবে?

সীতা অবিচল, তুমি যেখানে থাকবে, সেই তো আমার স্বর্গ!

সীতার দৃঢ়তা দেখে রাম লক্ষ্মণকে বলেন, তুমি ওঁকে বারণ কর, লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ নিরাবেগ কণ্ঠে বলেন, কর্তব্য পালনে কাউকে আমি বাধা দিতে চাই না, আর্য। চাঁদ রাহুগ্রস্ত হলেও তারকা তার অনুগমন করে। বনের তরু ভূপতিত হলে লতাও ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র আশ্রয়। উনি আপনার অনুগমন করে ওঁর ধর্ম পালন করুন, আমিও আমার ধর্ম পালন করি আপনার অনুগামী হয়ে।

লক্ষ্মণকে এই সংকল্প থেকে বিরত করার চেষ্টা করেন রাম। সীতাও বোঝান তাঁকে। লক্ষ্মণ হেসে বলেন, আমার গুরুর পদসেবা আপনি একাই করতে চান, আর্যে? তা হবে না। আজ থেকে ওঁর দুটি চরণের দক্ষিণটি হবে আপনার, বামটি আমার।

রাম বুঝতে পারেন, এরা কৃতসংকল্প। তাই আর দ্বিরুক্তি করেন না। নিঃশব্দে রাজ পোষাক, অলঙ্কার, কণ্ঠহার খুলে রেখে বল্কল পরেন। লক্ষ্মণের হাতেও তুলে দেন আর একটি বল্কল।

হঠাৎ বাইরে কোলাহল শোনা যায়। রাম বলেন, লক্ষ্মণ, দেখ তো কিসের কোলাহল?

লক্ষ্মণ দেখে এসে বলেন, ক্ষুব্ধ শোকার্ত পরিজন আর প্রজারা পথ রোধ করেছে। তারা আপনাকে বনবাসে যেতে দেবে না।

রাম বলেন, তা হয় না, লক্ষ্মণ, পিতৃসত্য পালনের জন্যই আমার বনবাসে যেতে হবে। তুমি ওঁদের সরে যেতে অনুরোধ কর।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এলেন প্রবীণ রাজকর্মচারী।—আপনারা যাবেন না, যাবেন না যুবরাজ। মহারাজ আপনাদের বনগমনের সংবাদ শুনে উন্মত্ত গজের মতো ধূলি-ধূসরিত জীর্ণ দেহে ছুটে আসছেন।

শুনে বিচলিত বোধ করেন রাম। বলেন, তাহলে পিতার আসার আগেই আমাদের এই নগর ত্যাগ করে যেতে হবে, লক্ষ্মণ। তোমরা আমাকে অনুসরণ কর।

রামের অনুরোধে প্রজারা পথ ছেড়ে দেয়। শোকার্ত জনতার বিলাপের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে যান বল্কলধারী রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ। যাত্রা করেন বনের উদ্দেশ্যে।

নগর যেন শ্মশান। প্রাসাদ শোকের পুরী। অথচ মাত্র তিনিটি প্রাণী নেই এখানে—রাম, সীতা, লক্ষ্মণ!

শোকে, আত্মগ্লানিতে শয্যা নিয়েছেন দশরথ। তাঁর সেবা করছে রানী কৌশল্যা আর সুমিত্রা। শান্ত করার চেষ্টা করছেন মহারাজকে। কিন্তু অনুতাপে আত্মগ্লানিতে হাহাকার করছেন রাজা দশরথ। হে ঈশ্বর, এর চেয়ে আমাকে নিঃসন্তান করলে না কেন? রামকে অন্য রাজার সন্তান করলে না কেন? কৈকেয়ীকে কেন বনের ব্যাঘ্রী করলে না?

বন থেকে শূন্য রথ নিয়ে ফিরে এলেন সুমন্ত্র।

দশরথ ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করেন, ভাই সুমন্ত্র, ওরা কোথায়? ওরা আসেনি? কোথায় আমার রাম? কোথায় লক্ষ্মণ? কোথায় আমার সেই ভক্তিপরায়ণা বিদেহ রাজদুহিতা সীতা?

অধোবদনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন সুমন্ত্র।

চীৎকার করে ওঠেন দশরথ, ওদের সব দুঃখের কারণ আমি, আমি। ওদের মৃত্যুপথযাত্রী হতভাগ্য পিতার উদ্দেশেও কি কিছু বলেনি তারা?

সুমন্ত্র দশরথকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আপনি এমন বিচলিত হচ্ছেন কেন, মহারাজ ? মাত্র চোদ্দ বছর পরেই তো আবার তাদের দেখতে পাবেন আপনি।

তবু শান্ত হলো না দশরথ। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রাম সীতা লক্ষ্মণের সংবাদ নিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

সুমন্ত্র লক্ষ্য করেন, ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছেন দশরথ। স্তিমিত হয়ে আসছে স্বর। গোপনে প্রবীণ অমাত্যকে বলেন সুমন্ত্র, মহারাজের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটছে, আপনি সবাইকে সংবাদ দিন।

দশরথ একসময় ক্লান্ত স্বরে ডাকেন কৌশল্যাকে।—কৌশল্যা, আমার অঙ্গ স্পর্শ কর। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।

কৌশল্যা মহারাজের গায়ে হাত রেখে বললেন, আপনি শান্ত হন, মহারাজ। একটু বিশ্রাম করুন।

রাজা দশরথের তখন চেতনা বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে। অস্ফুটে বলে চলেছেন, হায়, পুত্র, রাম! আমি ভেবেছিলাম, রাজ্যে তোমাকে অভিষিক্ত করে, প্রজাদের কৃতার্থ করে, 'ভাইদের সমান সম্পদের অধিকারী কর'—তোমাকে এই আদেশ দিয়ে বানপ্রস্থে যাব। কিন্তু এক নিমেষে কৈকেয়ী সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিল।

একটু থেমে আরো ক্লান্ত স্বরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, কৈকেয়ী, তোমার ইচ্ছেই সফল হোক। রাম বনে গিয়েছে, আমিও আসন্ন মৃত্যুর পথে। এবার তোমার আপন পুত্রটিকে অবিলম্বে নিয়ে এস··· তাকে সিংহাসনে বসাও। তোমার আনন্দদায়ক পাপ পূর্ণ হোক।

সুমন্ত্র ও অমাত্যরা শান্ত করার চেষ্টা করেন দশরথকে। কিন্তু দশরথ হঠাৎ ওপরের দিকে তাকিয়ে চাপা উত্তেজনায় চীৎকার করে ওঠেন, ঐ যে, ঐ যে, সন্তপ্ত-হৃদয় আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমার পিতৃপুরুষেরা স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন। জল আন। কে আছ এখানে, জল আন।

সুমন্ত্র নিঃশব্দে জল এগিয়ে দিলেন। জলে আচমন করে শান্ত

ক্লান্ত স্বরে মন্ত্রোশ্চারণের মতো উচ্চারণ করলেন দশরথ, এই যে ইন্দ্রের সখা দিলীপ,…এই যে রঘু আর এই যে আমার পূজ্যপাদ পিতা অজ !…আপনারা এলেন কেন ? আমিই তো আপনাদের কাছে যাচ্ছিলাম। আমারও যে যাবার সময় হয়ে এসেছে।…রাম ! সীতা ! লক্ষ্মণ ! আমি আমার পিতৃপুরুষদের কাছে যাচ্ছি। তোমাদের মঙ্গল হোক ! তোমাদের বনবাস নির্বিঘ্ন হোক।…হে, পিতৃগণ, আমি আসছি।…আমি আসছি !

মূর্ছিত হয়ে পড়লেন রাজা দশরথ। সকলে হাহাকার করে উঠলেন। পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করলেন মহারাজ।

রাজকুমার ভরত তখন মাতুলালয়ে। এসব কথা কিছুই জানতেন না তিনি।

রাজা দশরথের মৃত্যুসংবাদ গোপন রেখে তাঁকে খবর পাঠানো হয়েছিল, মহারাজ খুবই অসুস্থ।

মাতুলালয় থেকে দ্রুতগতি রথে তিনি অযোধ্যায় ফিরে আসছিলেন।

নগরের কাছাকাছি আসতেই এক প্রহরী এসে সংবাদ দিল, উপাধ্যায়েরা আপনাকে কিছু বিলম্বে অযোধ্যায় প্রবেশ করতে বলেছেন কুমার।

সামান্য অবাক হয়ে ভরত বললেন, কেন ?

প্রহরী বলল, কৃত্তিকা নক্ষত্রের একদণ্ড এখনও অবশিষ্ট আছে। কৃত্তিকা নক্ষত্রের কালে নগরে প্রবেশ অপ্রশস্ত। তাই রোহিণী নক্ষত্রের শুরুতেই আপনাকে নগরে প্রবেশ করার উপদেশ দিয়েছেন ওঁরা।

গুরুদের নির্দেশ মেনে নিলেন ভরত। কিছু দূরে একটি মন্দির দেখা যাচ্ছিল। সেই মন্দিরের পাশে একটি গাছের নিচে বিশ্রাম নেবার জন্য রথ থেকে নামলেন তিনি।

তারপর একসময় কৌতূহলী হয়ে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। মন্দিরের ভেতর চারটি অপূর্ব পাথরের মূর্তি। দেবসুলভ

আকৃতি হলেও মূর্তি বা প্রতিমাগুলিকে মানুষ বলে ভ্রম হয়। ভরত দেবতার বিগ্রহ মনে করে মূর্তিদের প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মন্দির রক্ষক এসে বাধা দিলেন, না না, প্রণাম করবেন না, প্রণাম করবেন না।

বিব্রত ভরত জিজ্ঞেস করেন, কেন? এই মন্দিরের বিগ্রহ যে কেউ প্রণাম করতে পারবে, কেউ পারবে না, এমন কি কোনো নিয়ম আছে?

মন্দির রক্ষক বললেন, না, না, তেমন কোনো নিয়ম নেই। আপনাকে সেজন্য নিষেধ করিনি।

—তাহলে?

—এ মূর্তি কোনো দেবতার নয়, ক্ষত্রিয়ের। কোনো ব্রাহ্মণ যেন দেবতা বলে ভুল করে এই ক্ষত্রিয়ের মূর্তিকে প্রণাম না করে, সেজন্যই বলছিলাম।

ভরত শুনে অবাক হলেন। বললেন, ক্ষত্রিয়ের মুর্তি! কে এঁরা?

মন্দির রক্ষক বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশের পরলোকগত রাজাদের প্রতি-মূর্তি এগুলো।

এই মূর্তিগুলোর ভেতরে রাজা দশরথের মুর্তি দেখে অবাক হলেন ভরত। জানতে চাইলেন, মৃতদের পাশে জীবিতদের প্রতিমূর্তিও এখানে রাখা হয় কিনা।

মন্দির রক্ষক বললেন, না, শুধু পরলোকগতদেরই মূর্তি রাখা হয় এখানে।

—তাহলে ঐ চতুর্থ মূর্তিটি—?

—সদ্য পরলোকগত রাজা দশরথের মূর্তি ওটি।

শুনেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন ভরত। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি মন্দির রক্ষকের কাছ থেকে সব ঘটনা জানতে চাইলেন।

মন্দির রক্ষক রামচন্দ্রের অভিষেক আয়োজন থেকে শুরু করে বন-বাস পর্যন্ত সব ঘটনাই আনুপূর্বিক জানালেন ভরতকে। শুনে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেন ভরত।

ঠিক সেই সময় সুমন্ত্রের সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করলেন রানী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী। ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রতিমা-দর্শনে এসেছেন তাঁরা।

ভরত ছুটে এসে প্রণাম করলেন কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে। কিন্তু নিজের মা কৈকেয়ীকে প্রণাম করলেন না।

কৌশল্যা সস্নেহে বললেন, বৎস, তুমি তো দুর্বিনীত নও, তাহলে তোমার মাকে প্রণাম করলে না কেন?

ভরত ক্ষোভের সুরে বললেন, কে মা? তোমরাই আমার মা। পবিত্র গঙ্গা-যমুনার মধ্যে পঙ্কিল কোনো নদীর মতো, তোমাদের দু'জনের ভেতর রানী কৈকেয়ীর অবস্থান শোভা পায় না।

কৈকেয়ী করুণ সুরে বললেন, কেন, বাছা, কি করেছি আমি?

ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিলেন, কি করেছ তুমি? তুমি নিজের সঙ্গে আমাকেও নিন্দার পাত্র করেছ। রাজ্য ভোগের লোভই যদি তোমার হয়ে থাকবে, পিতা কি তা পূরণ করতেন না? অথবা, যদি রাজমাতা হবার বাসনাই হয়ে থাকে, আর্য রামচন্দ্র কি তোমারও পুত্র নয়? ক্ষমতার লিপ্সা তোমার এতই প্রবল, যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বনে পাঠাতে, পুত্রবধূর হাতে বল্কল তুলে দিতেও তোমার বিবেকে এতটুকু বাঁধল না। পিতার মৃত্যু-আশঙ্কার কথাও একবার মনে পড়ল না তোমার! বিধাতা কি তোমার হৃদয় পাষাণ দিয়ে তৈরি করেছেন?

পুত্রের ধিক্কারে অধোবদন হন কৈকেয়ী। আস্তে বলেন, বৎস, এখন নয়, উপযুক্ত সময়ে এর উপযুক্ত উত্তর তোমাকে দেব।

মন্দিরের বাইরে অনেকের কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালেন সুমন্ত্র। ভরতকে বললেন, তোমার অভিষেক সামগ্রী নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে বশিষ্ঠ ও বামদেব আসছেন। তুমি শুভকার্যের জন্য প্রস্তুত হও, ভরত।

অবজ্ঞার সঙ্গে ভরত বললেন, অভিষেক! আমাকে নয়, যিনি রাজ্য চেয়েছিলেন, ঐ রানী কৈকেয়ীকেই তাহলে অভিষেক দান করুন। আমি চললাম।

সুমন্ত্র ব্যস্ত হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ভরত দ্রুতবেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, যেখানে রামচন্দ্র আছেন, সেখানে। রামহীন অযোধ্যা নয়, রাঘব যেখানে আছেন, সেই তপোবনই আসল অযোধ্যা।

সুমন্ত্রও ব্যস্তভাবে অনুসরণ করলেন ভরতকে। পুরবাসীরাও সঙ্গে চললেন।

তপোবনে রামচন্দ্রের আশ্রমের সামনে পৌঁছে চীৎকার করে বললেন ভরত, পিতৃসত্য পালক রামচন্দ্র, শুনুন, নির্দয় কৃতঘ্ন নীচ দুঃসাহসী কিন্তু ভক্তিমান আপনার এক দীনসেবক এসেছে আপনার আশ্রমদ্বারে। সে থাকবে, না চলে যাবে?

সেই আকুল আহ্বান গিয়ে পৌঁছাল রামচন্দ্রের কানে। স্বর শুনে তিনি চমকে উঠলেন। এ কার কণ্ঠস্বর? এ যে অবিকল পিতা দশরথের কণ্ঠস্বর! তেমনই গম্ভীর, তেমনই স্পষ্ট, অথচ আন্তরিকতায় স্নিগ্ধ। সেই মুহূর্তে তিনি লক্ষ্মণকে পাঠালেন আগন্তুককে ডেকে আনতে।

ভরত ও সুমন্ত্রকে নিয়ে লক্ষ্মণ আশ্রমে ফিরে এলেন। রাম ভরতকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ভরত প্রার্থনা জানালেন, তিনিও রামচন্দ্রের কাছে এই আশ্রমেই থাকবেন। তাঁর সেবায় জীবন কাটাবেন।

রাম রাজী হলেন না। ভরতকে অযোধ্যায়ই ফিরে যেতে বললেন তিনি। তাঁকে রাজ্যভার গ্রহণ করে প্রজাপালনের দায়িত্ব নিতে বললেন।

এতে মনে আঘাত পেলেন ভরত। নিজেকে আরো বেশি অপরাধী বলে মনে হলো তাঁর।

রাম ভরতকে বোঝালেন, আমাদের বংশ সত্যকেই সম্পদ মনে করে। তুমি নিষ্পাপ, গুণবান, সত্যব্রত। তোমার মতো সর্বগুণান্বিত পুত্রের কি উচিত পিতার কথাকে মিথ্যায় পরিণত করা? তাঁর প্রতিশ্রুতিকে ব্যর্থ করে তাঁকে হেয় করা? তুমি রাজ্যভার গ্রহণ না করলে পিতৃসত্য পালিত হবে না, ভরত।

ভরত বললেন, উত্তম, কিন্তু একটি মাত্র শর্তে আমি আপনার রাজ্য পালন করতে পারি।

রাম বললেন, বল, কি শর্ত ?

—চোদ্দ বছর পর বনবাস থেকে ফিরে আপনার রাজ্য আবার আপনারই গ্রহণ করতে হবে।

অভিভূত রাম বললেন, উত্তম, তাই হবে।

ভরত কৃতার্থ হয়ে বললেন, আমার আর একটি প্রার্থনা আছে।

রাম বললেন, বল, কি প্রার্থনা ?

ভরত বললেন, আপনার ব্যবহৃত পাদুকা দুটি আমাকে দিতে হবে। যতদিন আপনি না ফিরছেন, ঐ পাদুকা সিংহাসনে রেখে আপনার প্রতিনিধিরূপে, রাজ্য পরিচালনা করব আমি। অভিষেকবারি ঢেলে দেব ঐ পাদুকাদুটির ওপরই।

রাম ভরতকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, দীর্ঘদিন ধরে আমি যা কিছু যশ অর্জন করেছিলাম, আজ নিমেষেই সেই যশ তুমি অর্জন করলে ভরত। এই নাও আমার পাদুকা ; তুমি রাজ্যে ফিরে যাও।

বিজয়গর্বে রামচন্দ্রের পাদুকাদুটি মাথায় নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে গেলেন ভরত।

এক বৎসর অতিক্রান্ত হলো। রাজা দশরথের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের দিন এগিয়ে এল।

শ্রাদ্ধের আগের দিন স্বামীকে চিন্তিত দেখে সীতা জানতে চাইলেন, ওঁর এই দুঃশ্চিন্তার কারণ কি ?

রাম বললেন, আগামীকাল পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। এই তপোবনে বসে পিতার যথোপযুক্ত শ্রাদ্ধ কিভাবে সম্পন্ন করব, তাই ভাবছি, মৈথিলি ! সীতা স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এজন্য শোক করছেন কেন, আর্যপুত্র ? ভরতই তো অযোধ্যায় সাড়ম্বরে শ্রাদ্ধ করবে। আপনি অবস্থানুযায়ী ফল-জল দিয়েই শ্রাদ্ধ করুন। এতেই পিতৃদেব পরম তৃপ্তি লাভ করবেন।

তবু রামচন্দ্রের মন ভারাক্রান্ত।

এমন সময় পরিব্রাজক তপস্বীর ছদ্মবেশে রাবণ এলেন আশ্রম-

দ্বারে। রাম তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন। বসার আসন দিলেন তাঁকে।

কথা প্রসঙ্গে রাম অতিথির গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। তাঁকে শ্রাদ্ধ বিধিতেও পারদর্শী দেখে জানতে চাইলেন. কি দিয়ে তর্পণ করলে পিতৃপুরুষের আত্মার তৃপ্তি হয়।

ছদ্মবেশী রাবণ নানা বিধান দিয়ে শেষে বললেন, কিন্তু এর ভেতরও শ্রেষ্ঠ—কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ। একমাত্র হিমালয়ের শিখরেই সন্ধান পাওয়া যায় সেই মৃগের। মহর্ষিরা ঐ মৃগমাংসেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু সেই মৃগ আয়ত্তে আনা খুবই কাষ্টসাধ্য।

রাম বললেন, যত কষ্টসাধ্যই হোক, সেই মৃগ আমি হিমালয় পর্বত থেকে সংগ্রহ করে আনবই।

রামের কথা শেষ না হতেই বনের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন রাবণ, কী আশ্চর্য! ঐ দেখুন, রাঘব—কাঞ্চনপার্শ্ব মৃগ। কিন্তু এখানে ঐ মৃগ এল কি করে? তাহলে কি হিমালয়ই আপনাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য, আপনার শ্রম লাঘবের জন্য, ঐ মৃগকে এই বনে পাঠিয়েছেন?

রাম তক্ষনি ধনুর্বাণ হাতে উঠে দাঁড়ালেন। সীতাকে ডেকে বললেন, আমি ঐ মৃগের সন্ধানে যাচ্ছি। অতিথি সেবার ভার আমি তোমার ওপর দিয়ে গেলাম, সীতা।

রাবণ দেখলেন, এই সুযোগ। রাম আশ্রম ত্যাগ করলেন। লক্ষ্মণও আশ্রমে অনুপস্থিত। মুহূর্তে স্বরূপ ধারণ করলেন রাবণ। সীতাকে বলপ্রয়োগে হরণ করে শূন্যে পাড়ি দিলেন।

সীতা আত্মরক্ষায় ব্যর্থ হয়ে চীৎকার করে রাম, লক্ষ্মণ আর তপস্বী-দের ডাকাতে লাগলেন।—রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে আছ রক্ষা কর আমাকে।

নারীকণ্ঠের সেই আর্ত-চীৎকার শুনে ছুটে এলেন জটায়ু। সর্ব-শক্তি দিয়ে বাধা দিলেন বারণকে। কিন্তু বৃথা। প্রচণ্ড যুদ্ধে রাবণের

হাতে নিহত হলেন তিনি।

রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেলেন।

ভরত সুমন্ত্রকে পাঠিয়েছিলেন রামচন্দ্রের কুশল সংবাদ জানতে। সুমন্ত্র ফিরে এলেন সীতা-হরণের দুঃসংবাদ নিয়ে।

সুমন্ত্রের কাছ থেকে সেই সংবাদ শুনে প্রচণ্ড আঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন ভরত।

সংজ্ঞা যখন ফিরে এল, শোকে ক্ষোভে ক্রোধে ভরতের মুখ তখন থমথম করছে। হঠাৎ তিনি দ্রুতবেগে অন্তঃপুরের দিকে ছুটে গেলেন।

তাঁকে বাধা দেবার জন্য সুমন্ত্রও ছুটে গেলেন ওঁর পিছে।

ভরত অন্তঃপুরের দরজায় এসে বিজয়াকে বললেন, বিজয়া, রানী-মাকে গিয়ে সংবাদ দাও, আমি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।

বিজয়া বলল, কোন রানীমাকে জানাব!

শ্লেষের সুরে বললেন ভরত, যিনি আমাকে রাজা দেখতে চেয়ে-ছিলেন, তাঁকে।

বিজয়ার কাছে সংবাদ পেয়ে কৈকেয়ী বিজয়াকে বললেন, ভরতকে ভেতরে ডেকে আন।

সুমন্ত্রকে নিয়ে কৈকেয়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন ভরত।

কৈকেয়ী শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো সংবাদ আছে, বৎস?

প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সঙ্গে বললেন ভরত, একটি সুসংবাদ আছে।

কৈকেয়ী বললেন, তাহলে একটু অপেক্ষা কর, আমি রানী কৌশল্যা আর সুমিত্রাকেও ডেকে আনি।

ভরত বাধা দিয়ে বললেন, সে সংবাদ ওঁদের শোনার মতো নয়।

সামান্য অবাক হলো কৈকেয়ী। বলেন, কেন?

গম্ভীর স্বরে বলেন ভরত, কারণ সেই সুসংবাদটুকু শুধু তোমারই আনন্দ বৃদ্ধি করবে।

—শুনি, কি সংবাদ।

—তুমি শুনে খুশি হবে, যাঁকে তুমি রাজ্যচ্যুত করে বনে পাঠিয়েছিলে, তাঁর পত্নী সীতা অপহৃতা হয়েছেন, নিশ্চয়ই এবার তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে ?

প্রচণ্ড আঘাতে কিছুক্ষণ স্থাণুর মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকেন কৈকেয়ী। তারপর গম্ভীর অকম্পিত স্বরে বলেন, তোমার মনে আছে, ভরত, প্রথম দিন প্রতিমা মন্দিরে তুমি যখন আমাকে ভর্ৎসনা করেছিলে, তখন তোমাকে আমি বলেছিলাম, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত স্থানে —তোমাকে আমি এর উত্তর দেব। আজ সেই সময় উপস্থিত হয়েছে।

ভরত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, শুনি, কি উত্তর।

গভীর স্বরে বললেন কৈকেয়ী, সবার চোখে আমি আজ অপরাধী। কিন্তু আমি যা করেছি তা আমার নিজের স্বার্থের জন্য নয়, ভরত।

ভরত অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, তাহলে কার স্বার্থে ? আমার ?

অকম্পিত স্বরে বলেন কৈকেয়ী, না, তোমাদের পিতার।

—পিতার !

হ্যাঁ, বৎস। অভিশপ্ত তোমাদের পিতার যন্ত্রণা লাঘবের কথা ভেবেই—।

বাধা দেন ভরত, অভিশপ্ত মানে ?

সুমন্ত্রকে অনুরোধ করেন কৈকেয়ী রাজা দশরথের সেই অভিশাপের কাহিনী ভরতকে শোনাতে।

সুমন্ত্র সবিস্তারে, রাজা দশরথের শব্দভেদী বাণে অন্ধমুনির পুত্র হত্যা থেকে শুরু করে, মুনির অভিশাপ দেওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাহিনী বলেন ভরতকে।

ভরত বিস্মিত হয়ে শোনেন সেই কাহিনী।

কাহিনী শেষ হতে কৈকেয়ী বলেন, পুত্রশোকাতুর মুনি অভিশাপ দিয়েছিলেন মহারাজকে, তুমিও আমার মতো পুত্রশোকে বিপন্ন হবে। আমি জানতাম, সত্যবাক মুনির অভিশাপ ব্যর্থ হতে পারে না। আমি

তাই মহারাজের কাছ থেকে বর প্রার্থনার সময় কৌশলে রামের বনবাস প্রার্থনা করেছিলাম।

—কেন?

—ভেবেছিলাম, রামের বনবাসে পুত্র বিচ্ছেদের শোক ভোগ করে শাপমুক্ত হবেন মহারাজ।

সামান্য ক্ষোভের সঙ্গে বললেন ভরত, তা বলে চোদ্দ বছর বনবাস?

অনুতপ্ত স্বরে বললেন কৈকেয়ী, চোদ্দ দিন বলতে গিয়ে মনের অস্থিরতায় আমি চোদ্দ বছর বলে ফেলেছিলাম, ভরত। সেজন্য আমি অনুতপ্ত। কিন্তু বিশ্বাস কর, রাজ্য লোভ নয়, রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই আমি ঐ বর প্রার্থনা করেছিলাম। কুলগুরু বশিষ্ঠ, বামদেব—সবাই একথা জানেন। একথার সত্যতা স্বীকার করেন।

ঘটনাটি কুলগুরুদের অনুমোদিত শুনে মায়ের প্রতি প্রসন্ন হন ভরত। মার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হন। মা-কে প্রণাম করে বলেন, তুমি আমাকে ক্ষমা কর মা। আমি ভ্রাতৃস্নেহে ক্রুদ্ধ হয়ে তোমাকে ভর্ৎসনা করেছিলাম।

কৈকেয়ী আবেগে ভরতের হাত দুটি নিজের হাতে তুলে নেন। চোখে আনন্দাশ্রু। বলেন, পুত্রের অপরাধ কোন মা ক্ষমা না করে পারেন, ভরত! তুমি যা বলেছিলে, না জেনেই বলেছ,—এতে তোমার কোনো দোষ নেই।

সীতার উদ্ধারে সর্বশক্তি নিয়োগের সংকল্প জানিয়ে, মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসেন ভরত।

ইতিমধ্যে রামচন্দ্র রাক্ষস রাবণকে বধ করে সীতাকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এসেছেন।

আশ্রমবাসীরা সবাই আনন্দে অধীর।

একদিন রাম সীতার সঙ্গে বসে পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ করছেন,

দূরে শোনা গেল বহু কণ্ঠের কলরব। বেজে উঠল পটহ আর মঙ্গল-শঙ্খ।

সামান্য অবাক হলো রাম। কে আসছে? কারা আসছে?

লক্ষ্মণ ছুটে এসে সংবাদ দিলেন, বিশাল বাহিনী নিয়ে ভ্রাতৃবৎসল ভরত রামচন্দ্রকে দেখতে আসছেন। মায়েরাও সঙ্গে এসেছেন।

বলতে বলতেই ভরত তিন মা-কে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেন। দীর্ঘদিন পর আবার পুনর্মিলিত হলেন পরিবারের সবাই। সে যেন এক অধীর আনন্দোৎসব।

ভরত রামকে প্রণাম করে বললেন, এবার আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করে আমাকে মুক্ত করুন, আর্য! এ গুরুভার আমি আর বহন করতে পারছি না।

কৈকেয়ী ভরতকে সমর্থন করে বললেন, তাই হোক, বৎস। আমাদেরও এ চিরদিনের বাসনা!

শত্রুঘ্ন এসে সংবাদ দিলেন, বশিষ্ঠ, বামদেব প্রজাদের সঙ্গে অভি-ষেক সম্ভার নিয়ে রামচন্দ্রের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন।

কৈকেয়ীর আদেশে এবং অন্যান্য গুরুজনদের অনুমতি নিয়ে রাম এগিয়ে গেলেন অভিষিক্ত হতে। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান ও অন্যান্য মিত্র ও পরিজনদের জয়ধ্বনির মধ্যে সম্পন্ন হলো অভিষেক অনুষ্ঠান।

তারপর, রামচন্দ্রের ইচ্ছে অনুযায়ী রাবণের পুষ্পক রথটি এল সবাইকে নগরীতে নিয়ে যাবার জন্য।

দীর্ঘদিন পরিবারের সবার সঙ্গে রামচন্দ্র ফিরে চললেন অযোধ্যায়।

অবিমারক ॥ ভাস

স্বরেন্দ্রনাথ দেব

সে অনেককাল আগেকার কথা। ভারতবর্ষে বৈরন্ত্য নামে এক নগর ছিল। সে নগরের অধীশ্বর কুন্তিভোজ। তাঁর দুই কন্যা—কুরঙ্গী ও সুমিত্রা।

রূপে-গুণে কুরঙ্গীর যেমন জুড়ি নেই, তেমনি তার সাধ-আহ্লাদের সীমা নেই। তাছাড়া, তার বাড়ন্ত বয়স। তাই তাকে নিয়ে রাজার ভাবনারও যেন শেষ নেই।

কুরঙ্গীর কিনা সাধ হলো—উদ্যানে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল সাজ-সাজ রব। পালকি এল, বেহারা এল, সখীরা এল, মন্ত্রীরা এল, এল আরো কত কী। কার সাধ্য বিনা হুকুমে সে উদ্যানের ধারে কাছে ঘেঁসে?

কুরঙ্গী রাজার চোখের মণি। একটুখানি কাছ ছাড়া হতে না হতেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে! কিন্তু কতদিনই বা কাছে ধরে রাখবেন—মেয়ের যে বিয়ের বয়স হলো। এই তো আজই কাশীর রাজপুত্রের সঙ্গে কুরঙ্গীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে দূত এসেছে। কাশী-রাজের পুত্র তাঁর জামাতা হবে—এ কথা ভেবেই রানীর কী আনন্দ! আনন্দ রাজারও কম নয়, তবু তাঁর মনের কোণে কী-এক অজানা ভয় উঁকি মারে। স্বস্তি পান না তিনি। রানীকে ডেকে তাই বলেন —কত দিক দেখে শুনে তবেই না বিয়ে।......

রাজার কথা শেষ না হতেই কোথেকে একটা গোলমালের শব্দ

ভেসে এল। গোলমালটা খুব দূরে বলে মনে হচ্ছে না। রাজা-রানীর চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ—কুরঙ্গীর কিছু হলো না তো? সে যে আজ উদ্যানে গেছে। ঐ তো মন্ত্রী কৌঞ্চায়ন দ্রুতপায়ে এদিকেই আসছেন। না জানি কী খবর আনছেন তিনি!

মন্ত্রী এসে বললেন, "মহারাজ, আপনার আজ্ঞা মতো আমি রাজকন্যা কুরঙ্গীর সঙ্গে উদ্যানে গিয়েছিলাম। উদ্যানে পা দিয়েই রাজকন্যার সে কী আনন্দ! সারাক্ষণ সখীদের সঙ্গে হাসিগানে খেলায় মেতে রইল সে। তারপর শুরু হলো ফেরার তোড়জোড়। রাজকন্যা চলল তার পালকির দিকে। গোছগাছ প্রায় সারা। দাস-দাসীদের হৈ-হুল্লোড়ে তবু কান পাতা দায়। এমন সময় কোত্থেকে ধেয়ে এল এক বেরসিক হাতি। ওদের অফুরন্ত হাসি আর কল-কল মুখরতাই বুঝি হাতিটাকে দিল ক্ষেপিয়ে। আক্রোশে ফেটে পড়ল তার ঘন ঘন বৃংহণে। মুখ বেয়ে নামল তার মদের ধারা। চারদিক কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটল সেই ক্ষ্যাপা হাতি রাজকন্যার পালকির দিকে। পুরু ধূলির চাদরে ঢাকা তার সারা গা, প্রলয়ের মাতন বুঝি তার পায়, তাই ঐ মুহূর্তে সে যে সত্যি কত ভয়ঙ্কর, সেটা বোঝা কঠিন। বোঝাই গেল না, মাহুতটা কখন তার পায়ের তলায় চাপা পড়ল। দুরন্ত গতিতে সব কিছু লণ্ড ভণ্ড করে জন্তুটা সবাইকে এমন নাজেহাল করে দিল যে······।

ধৈর্যে ভাঙন ধরে রাজার। তিনি শুধু জানতে চান কুরঙ্গীর কুশল। মন্ত্রী জানান, কুরঙ্গীকে নির্বিঘ্নে ভেতরে পৌঁছিয়েই তবে তিনি এখানে এসেছেন। একথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন রাজা। বলেন, "বলুন এবারে, যা বলছিলেন।"

কৌঞ্চায়ন সখেদে বলেন, "আমার মন্ত্রিত্বের অপবাদ ঘটাতেই বুঝি হাতিটা আজ এমন অঘটন ঘটাল।"

কৌতূহল চাপতে পারলেন না রাজা, "কী ঘটেছে—সেটা বলুন।"



মন্ত্রী বলে চলেন, "ছেলেরা যেদিকে পারল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল। মেয়েরা কেঁদে কেটে একাকার! হাতিটাকে রুখতে গিয়ে মারা পড়ল জনা কয়েক রক্ষী। সঙ্গে আনা জিনিসপত্তরগুলোর কি দশা হলো—সেইদিকে যেই নজর দিয়েছি, অমনি সেই ফাঁকে ক্ষ্যাপা হাতিটা গিয়ে চড়াও হলো পালকির ওপর। উঃ! ভয়ের চোটে রাজকন্যার সে কি ভীষণ চীৎকার! 'গেল, গেল' রব উঠল চতুর্দিকে। কিন্তু না, মুহূর্তেই ঘটনার মোড় গেল ঘুরে। দৈবক্রমে কোত্থেকে এক যুবকের আবির্ভাব হলো সেই উদ্যানে।"

'কে সে?—' রাজার এই প্রশ্নে মন্ত্রীর কণ্ঠে আবেগের ছোঁয়া লাগে, "কী বলব তার কথা, মহারাজ? ভয় কাকে বলে, সে জানে না। যেমন সুদর্শন তার দেহ, তেমনি দেখবার মতো তার বীরত্ব। সর্বনাশের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে গেল সে পালকিটার পাশে। পরম অন্তরঙ্গতায় রাজকন্যাকে দিল দুর্লভ আশ্বাস। তারপর ঘুরে দাঁড়াল হাতিটার দিকে। আচমকা কয়েক ঘা চড় বসালো জন্তুটার গায়। আর যায় কোথায়? ক্ষ্যাপা হাতি আরো গেল ক্ষেপে। রাজকন্যাকে ছেড়ে তেড়ে গেল শুঁড় উঁচিয়ে—যুবককে মারবে বলে। ভয়ে শিউরে উঠে প্রমাদ গুনল সবাই।

রাজা ব্যগ্র হয়ে বলেন, "তারপর, তারপর?" মন্ত্রী বলেন, "তারপর ভাগ্যিস্, অমাত্য ভূতিক তখন এসে পড়েছেন উদ্যানে। দেখতে পেয়েই তাঁকে আমি তক্ষুনি ডাকলাম। তিনি আসা মাত্র দু'জনে মিলে চটপট রাজকন্যাকে পালকিতে চাপিয়ে সেই ফাঁকে পালিয়ে এসেছি।"

রাজা বলেন, "অমাত্য ভূতিককে দেখছি না যে?" কৌঞ্চায়ন জানান, "অমাত্য ভূতিক তোরণ থেকেই ফিরে গেছেন উদ্যানে! যুবকের খোঁজ-খবর সেরে সোজা আপনার কাছে চলে আসবেন।"

খানিক বাদে অমাত্য এলেন। রাজা জানতে চাইলেন যুবকের কথা। অমাত্য জানালেন, "অতি বিচিত্র সেই যুবকের ক্রিয়াকাণ্ড,

মহারাজ! বীর্ বিক্রমে কিছুক্ষণের মধ্যেই সে হাতিটাকে কোণঠাসা করে ফেলল। দেখতে দেখতে ক্ষ্যাপা হাতিটা কেমন যেন তার বশ মানল। হাতিটা যেন তার খেলার সাথী—এমনিভাবে তার সঙ্গে যুবক রঙ্গকৌতুক করতে লাগল। যেই না মুগ্ধ জনতার উল্লাস করতালিতে ফেটে পড়ল, অমনি সচকিত হয়ে লজ্জায় যুবক স্থান ত্যাগ করল।"

যুবকের নির্বিঘ্ন প্রস্থানের সংবাদে রাজা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

ভূতিক বলে চলেন, "সুযোগ বুঝে হাতিটাকে ধরে বেঁধে হাতিশালে পাঠিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম সেই যুবকের খোঁজে।"

কুন্তিভোজ জিজ্ঞেস করেন, "যুবক নাকি জাতিতে চণ্ডাল?"

ভূতিক বলেন, "ওটা গুজব, মহারাজ। যে কারণেই হোক—যুবক তার পরিচয় গোপন রেখেছে। আহা! অমন হীরের টুকরো ছেলে! চেহারা বলুন, ব্যবহার বলুন, কথাবার্তা বলুন—কোনোটাই তার অন্ত্যজের মতো নয়। তা'ছাড়া অমন বীরত্ব আর ত্যাগ—না, মহারাজ, তাকে চণ্ডাল বলতে কারো মন সায় দেবে না। সে নিজেকে লুকোচ্ছে বটে, কিন্তু সূর্যকে কি হাত দিয়ে ঢেকে রাখা যায়?"

ভূতিকের মুখে রাজা আরো শুনলেন যে, যুবক অবিবাহিত। তাঁর পিতাও 'অন্ত্যজ' বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর চেহারায় ও ব্যক্তিত্বে স্পষ্ট আভিজাত্যের ছাপ।

যা হোক, রাজা অমাত্যকে বিষয়টির যথাযথ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে রাজকন্যার বিয়ের প্রসঙ্গে মন দিলেন।

কাশীরাজের দূত প্রাসাদে প্রতীক্ষা করছে। অতিথির আদর আপ্যায়নের ত্রুটি নেই ঠিকই, কিন্তু আসল কথাটাই যে তাকে এখনো বলা বাকি। রাজা ভেবে পান না—কি বলবেন তাকে? কত রাজাই তো কত দূত পাঠাচ্ছেন—সবার ঐ এক অনুরোধ—রাজকন্যা কুরঙ্গীকে তাঁরা পুত্রবধূরূপে পেতে চান। কাশীরাজ ও সৌবীররাজের কথা অবশ্য আলাদা। এঁরা তাঁর ভগ্নীপতি; বিশেষত, সৌবীররাজ হলেন

মহারানীর নিজের দাদা। সৌবীররাজের পুত্রের সঙ্গে কুরঙ্গীর বিয়ে তো সেবার হয়-হয়, হলো না কেবল পাত্রীর অল্প বয়সের কথা ভেবে। কিন্তু কই, তারপর কতদিন হয়ে গেল, সৌবীররাজ আর কোনো যোগাযোগই করলেন না। তিনি নিজে থেকে ইদানীং যোগাযোগের চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু কোনও মতে তাঁর কুশল সংবাদটা পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারছেন না।

অমাত্য ভূতিক অবশ্য তাঁকে জানিয়েছেন—সৌবীররাজের বিষয়ে সুনিশ্চিত তথ্য এখনও তাঁর হাতে আসেনি ; তবে গুপ্তচরদের মাধ্যমে এটুকু জানা গেছে যে, সৌবীররাজ সপরিবারে আত্মগোপন করে আছেন। মন্ত্রীরাই তাঁর রাজত্ব দেখাশুনা করছেন। এরকমটা যে কেন ঘটল তার কারণ অবশ্য এখনও জানা যায় নি।

কুন্তিভোজ ভাবেন—কি কারণে এই আত্মগোপন ? তবে কি তাঁর সখা কোনো কঠিন পীড়ায় ভুগছেন, নাকি এটা তাঁর সেবকদের রাজভক্তি পরীক্ষার অছিলা ? অথবা, এমনও হতে পারে, কারো কোনো অভিশাপে তাঁর এই অজ্ঞাতবাস।

কুরঙ্গীর সম্বন্ধের ব্যাপারে মন্ত্রীদের পরামর্শ চাইলেন রাজা। মন্ত্রীরা বললেন—সৌবীররাজের সম্পর্কে যত দুর্বলতাই থাকুক, তাঁর যেহেতু কোনো সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কাশীরাজের দূত সম্প্রতি যে প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত, তা নাকচ করা সমীচীন হবে না।

রাজকন্যার বিয়ের চিন্তায় এমনিভাবে দিন কেটে যায় কুন্তিভোজের কিন্তু দিন যে আর কাটতে চায় না সেই যুবক অবিমারকের। হাতির আক্রমণের মুখে কুরঙ্গীকে প্রথম দেখার পর থেকেই সে এক অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সে উচ্ছলতা আর নেই, লোকজন ভালো লাগে না, এমন কি তার বয়স্য সন্তুষ্টের সঙ্গও তার পছন্দ নয়। দিনরাত চুপচাপ একা একা শুধু ভাবে আর ভাবে। ভাবে সেই রাজকন্যার বিপন্ন ভীরু চাহনির কথা, তার অঙ্গে অঙ্গে উপচে-পড়া কোমল লাবণ্যের কথা, তার শিহরিত তনুলতার কথা। স্বপ্নে কুরঙ্গী, জাগরণে

কুরঙ্গী। আবার তার চিন্তা হয়, এ সব বুঝি তার পূর্ব জন্মের কথা। সেই স্মৃতি আঁকড়ে সে মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছে। আর, এ জন্মের হলেই বা কি ? তার পরিচয় তো 'চণ্ডাল'। ওদিকে কুরঙ্গী হলো ক্ষত্রিয় রাজার কন্যা। তাই তার পক্ষে রাজকন্যা কুরঙ্গীকে পাবার আশা দুরাশা।

এদিকে কন্যান্তঃপুরে কুরঙ্গীকে নিয়ে হয়েছে সমস্যা। হাতিটার সেই অলক্ষুণে কাণ্ডর পর থেকেই কুরঙ্গীর অদ্ভূত ভাবান্তর ঘটেছে। ফুলকে যে এত ভালবাসে, সে এখন তার ঘরে সাজান রাশি রাশি সেরা ফুলের দিকে ভুলেও তাকায় না। সাধ-আহ্লাদ সব বুঝি সে ভুলেই গেছে। আহারে রুচি নেই, খেলাধুলোয় আগ্রহ নেই, সাজপোষাকের সখ নেই। সখী ছাড়া যার চলে না, সে এখন সখীদের সঙ্গে ভাল করে কথাও বলে না। যদিও বা দৈবাৎ কিছু বলে, পরক্ষণেই সে প্রসঙ্গ ভুলে যায়। ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ডাকতে গিয়ে পরিচারিকাদের নাম ভুল করে, হুকুম করে উল্টোপাল্টা। একা থাকতে ভালবাসে, নিরালায় কাঁদে, লুকিয়ে লুকিয়ে হাসে। এমনিভাবে দিনে দিনে আরো কৃশ হয়ে যাচ্ছে কৃশাঙ্গী কুরঙ্গী। ফ্যাকাশে হচ্ছে তার গায়ের রঙ, চোখের কোণে পড়েছে কালি, মুখে তার মলিন ছায়া।

"কি হয়েছে ?" জিজ্ঞেস করলে সে বলে, "অসুখ করেছে।" অথচ অসুখটা যে কি, সে কথা মুখ খুলে কারো কাছে একটিবারও সে বলে নি।

ধাত্রী জয়দা কিন্তু গোড়া থেকেই তার ভাবসাব টের পেয়েছে। বুঝেছে সে—রাজকন্যার এই অসুখ মূলত মনের। আর এ অসুখের কারণ আসলে সেই অজ্ঞাত পরিচয় যুবক, যে সেদিন অমনি করে তাকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। যেমন চোখ-জুড়ানো রূপ, তেমনি মন ভুলানো গুণ ! সত্যি, তাকে একবার দেখলে কোন তরুণী ভুলতে পারে ? লজ্জায় হোক আর বংশগৌরবের কথা ভেবেই হোক, কুরঙ্গী যে তাঁর গোপন কথা কাউকে বলে নি, তার জন্যে তাকে দোষ দিয়ে আর কাজ কি ? বরং যাওয়া যাক সেই যুবকের আস্তানায়।

এমনি সব ভেবে কুরঙ্গীর সখী নলিনিকাকে সঙ্গে নিয়ে ধাত্রী জয়দা যাত্রা করল সেই যুবকের গোপন আবাসে। যেতে যেতে পথে দু'জনে বলাবলি করছিল তারা ; অমন মানুষ কখনও চণ্ডাল হয় ? নিশ্চয়ই তার আসল পরিচয় আড়াল করছে। কিন্তু রহস্যটা কি কোনো মতে ভাঙ্গা যায় না।

এমন সময় অকস্মাৎ কার গম্ভীর গলায় উচ্চারিত হলো ;

"অমন মানুষ কুলীন কিনা দূর হবে এই দুর্ভাবনা
সময় হলে পর।
ভাল চাস্ তো রাজকন্যে মুমূর্ষু আজ যার জন্যে
তাকেই গিয়ে ধর॥

শুনে দু'জনের গায়ে কাঁটা দিল। এ তো মানুষের গলা নয়, নির্ঘাত কোন অশরীরীর কণ্ঠস্বর। তবে আর দেরী কেন ? তাকেই গিয়ে ধরা যাক। পথ চিনে চলতে খুব কষ্ট হলো না, কেননা সেই অঘটনের দিনে অদম্য কৌতূহলে তারা চুপিচুপি যুবকের পিছু নিয়েছিল। যা হোক, জায়গামতো পৌঁছে এদিক ওদিক দেখে পা টিপে টিপে তারা যুবকের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। দেখল নিরালায় একটি ঘরে যুবক একা একা বসে আছে। কী এক আবেশে যেন বিভোর। মধ্যে মধ্যে কাকে উদ্দেশ করে কী যেন সব বলছে। দরজায় যে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, সেদিকে তার কোনো হুঁশই নেই। খানিকবাদে যখন দেখতে পেল, তখন সলজ্জ মিনতির সুরে তাদের স্বাগত জানাল।

ধাত্রী জিজ্ঞেস করল, "একা একা কি করছিলেন ?" অবিমারক ভেবে পায় না কি বলবে। তবু বলে ফেলল, "এই একটু যোগশাস্ত্রের কথা চিন্তা করছিলাম।" মৃদু হাস্যে ধাত্রী বলল, "আমাদের প্রাসাদের ভেতরেও একজন একমনে যোগচিন্তা করছে। তা দু'জনে মিলে করলে চিন্তাটা আরো জোরদার হয় না কি ?"

এ কথার গূঢ় মানে বুঝতে অবশ্য দেরি হয় না যুবকের। তার কথা ভেবে রাজকন্যা কুরঙ্গীর অবস্থাও যে তারই মতো, এটা জেনে সে আশ্বস্ত

হয়। কিন্তু, ম্রিয়মাণা কুরঙ্গীর জন্যে কি করতে পারে সে? অথচ, কিছু না করতে পারলে কুরঙ্গী যে আর বাঁচে না। তাই ধাত্রীর পরামর্শই মাথা পেতে নেয় সে : কন্যান্তঃপুরের ভারপ্রাপ্ত অমাত্য ভূতিক আজ কাশীরাজের দূতের সঙ্গে কাশী রওনা হয়েছেন। আন্দাজ করা যায়, রক্ষীদের পাহারা আজ রাতে কিছুটা শিথিল হবে। এই সুযোগে সাহসে বুক বেঁধে তাকে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করতে হবে। রাজবাড়ির পথঘাটের খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে ধাত্রী জানায়—তাদের দিক থেকে সহযোগিতার কোনো ত্রুটি হবে না। কুরঙ্গীকে বাঁচাতে সেদিন অনেক বড় বিপদের ঝুঁকি সে নিয়েছিল, এ তো সামান্যই।

যুবকের সম্মতি পেয়ে জয়দা ও নলিনিকা ফিরে গেল কন্যান্তঃপুরে। এবার তাদের প্রতীক্ষার পালা।

দেখতে দেখতে দিনের আলো কখন গেল নিভে। আঁধারে অদৃশ্য হলো চরাচর। ঘনিয়ে এল নিষুতি রাত। কুরঙ্গীর চোখের পাতায় শুধু ক্লান্তি। সে শুনেছে—কাশীরাজের পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ের কথা শেষ অবধি পাকা হয়েছে। ভাবী জামাতাকে মহারানী একবার এখানে আনিয়ে দেখতে চান, এই জন্যেই যা দেরি। ভেবে কূল পায় না রাজ-কন্যা, কি করে তার মনের মানুষকে কাছে পাবে। কষ্টে তার বুক ফাটে, তবু মুখ ফোটে না। অবসাদে আচ্ছন্ন তার দেহ-মন। আধোঘুমে, আধো জাগরণে সে শুনতে পায়—অদূরে কোথায় কারা যেন বলাবলি করে—'শুনেছ তো আজ রাতে হবে তার বিয়ে'।

এদিকে তখন মধ্যরাত। অবিমারক বেরোচ্ছে তার নিঃসঙ্গ নৈশ অভিযানে। আপাদমস্তক কালো পোষাকে ঢাকা, মুখে কিম্ভূতকিমাকার এক মুখোশ, হাতে নীল খড়্গ, বুকে সাহসের অটুট বর্ম। সঙ্গে রয়েছে প্রাসাদে আরোহণের একমাত্র সহায়ক রজ্জু। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলে অবিমারক। রক্ষী পুরুষদের দৃষ্টি এড়িয়ে, বহু বাধা পেরিয়ে এসে পৌঁছয় কন্যান্তঃপুরে। তস্করবেশ ত্যাগ করে সে নিজেকে সাজায় এবার বরবেশে।

প্রাসাদশীর্ষে শিলাতলে শয়ানা কুরঙ্গীর ক্লান্ত দু'চোখে তখন ঘুমের লুকোচুরি। সখী নলিনিকাকে বিদায়ের পূর্বে একবার কাছে আসতে বলল রাজকন্যা। নলিনিকা জানাল—তথাস্তু। কিন্তু এ কী? নলিনিকা কোথায়? ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক কুরঙ্গী দেখেন তার পাশে সেই ক্ষণিকের চেনা যুবক, তার হারানো মাণিক আপনজন। নিজের চোখকে কুরঙ্গী যেন বিশ্বাস করতে পারে না; এ কি সম্ভব, নাকি এ কোনো ঐন্দ্রজালিকের ভোজবিদ্যা? অথবা অসমসাহসী ঐ যুবকের পক্ষে কোনটাই বা অসাধ্য?

স্তব্ধতার ঘোর কাটে ধাত্রীর প্রবেশে। পিছু পিছু আসে নলিনিকা। রাজকন্যার সংকোচের ভীরুতা কাটাতে তারা সাহায্য করে, তারপর কুরঙ্গীসহ অভ্যাগতকে সাদর আমন্ত্রণ জানায় অভ্যন্তর মণ্ডপের সাজান বাসরে। অন্ধকার ততক্ষণে হালকা হয়ে এসেছে, দেখা গেছে জ্যোৎস্নার উদ্ভাস। অভ্যন্তর মণ্ডপে যেতে যেতেই যেন কুরঙ্গী ও তার দয়িতের 'সপ্তপদী' সমাপন হলো। সামান্য দূরত্বটুকু পেরোতে পেরোতে দু'জনের মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমে গেল মিলিয়ে।

কন্যান্তঃপুরের নিভৃতে আমোদ-প্রমোদে দিনগুলি দু'জনের বড় সুখেই কাটছিল। দেখতে দেখতে একটি বছর যে কোন দিক দিয়ে কেটে গেল, কারো সেদিকে খেয়ালই ছিল না। কিন্তু সুখ বেশি দিন সয় না। কানাঘুষো হতে হতে কথাটা একদিন কেমন করে খোদ রাজার কানে গেল। কথাটা যাতে আর না ছড়ায়, রাজা তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করলেন। রুদ্ধ করে দেওয়া হলো কন্যান্তঃপুর, কড়া পাহারা বসল চারদিকে। এরকম একটা-কিছু যে ঘটতে পারে, চতুর অবিমারক সেটা আগেই টের পেয়েছিল। তাই সে সময় থাকতে পালিয়ে বেঁচেছে। কিন্তু কুরঙ্গীর অবস্থা হলো অতি করুণ। একে বিরহিণী, তার উপর নজরবন্দী। বাঁচা আর মরা—দুই-ই তার কাছে সমান।

কন্যান্তঃপুর থেকে পালিয়ে নগরের বাইরে এসে ক'টা দিন কোনো মতে কেটে গেল অবিমারকের। শরীরটাকে সে নির্বিঘ্নে নিয়ে এসেছে

বটে, কিন্তু মন তার পড়ে রয়েছে সেই কন্যান্তঃপুরে প্রিয়তমা কুরঙ্গীর কাছে। কুরঙ্গী ছাড়া জীবন তার কাছে অর্থহীন। অতএব জীবনের জ্বালা জুড়োতে হলে মরণই ভাল। তাই ঘুরতে ঘুরতে গ্রীষ্মের প্রখর দুপুরে সে যখন দেখল অদূর অরণ্যে দাউ দাউ দাবানল জ্বলছে, তখন সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরতে গেল সে। কিন্তু এ কী! আগুনের পরশ কি এমন শীতল হয় চন্দনের মতো? সারা অঙ্গে আগুনের শিখাগুলি এমন করে জড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ তার মধ্যে সে অনুভব করছে পিতার আলিঙ্গনের সুখস্পর্শ—! আত্মহত্যার প্রথম চেষ্টা তার ব্যর্থ হলো। হোক, তবু সে থামবে না। দুর্বিষহ এ জীবনে তাকে ইতি টানতেই হবে। ঐ, ঐ তো দেখা যাচ্ছে কিছু দূরে উঁচু পাহাড়। ঐ পাহাড়ের চূড়া থেকেই তবে সে মরণ-ঝাঁপ দেবে। মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করে সে ঝরণার জলে স্নান করতে গেল। স্নান শেষে ইষ্ট-মন্ত্র জপ করতে লাগল। জপ সেরে চরম মুহূর্তের জন্য এবারে প্রস্তুত হতে লাগল সে। কিন্তু তাকে স্তম্ভিত করে পাশে এসে দাঁড়াল এক বিদ্যাধর। অবিমারকের মনে পড়ল মহাজনদের কথা—মরণকালে মানুষ নানা উদ্ভট জিনিস দেখে; এও সেই বিভ্রম। কিন্তু না, বিদ্যাধর যে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে তার দিকে তখন থেকে একভাবে তাকিয়ে আছে! সে কে, কেনই বা তার মৃত্যুর মুহূর্তে প্রতিবন্ধক হয়ে এল? কৌতূহল দমন করতে পারল না যুবক। তার জিজ্ঞাসার উত্তরে বিদ্যাধর জানাল—তার নাম মেঘনাদ। সে এবং তার পত্নী সৌদামিনী যাচ্ছিল মলয় পর্বতে, সেখানে বিদ্যাধরদের উৎসব আরম্ভ হয়েছে কিনা, তাই। একটানা অনেকটা পথ অতিক্রমের পর পত্নীর অনুরোধে এই পর্বতে নামতে হলো; উদ্দেশ্য—কিছুক্ষণ বিশ্রাম। ঐ তো তার পত্নী সৌদামিনী অদূরে পাহাড়ী ফুল তুলছে। দেখে ভাল লাগল অবিমারকের।

অবিমারককে দেখে মেঘনাদের কিন্তু মনে হয়েছে---এ নিশ্চিত কোনো মন্ত্রভ্রষ্ট বিদ্যাধর, কারণ এমন রূপ মানুষের হয় না। তবু তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল বিদ্যাধর। মৃত্যুকালে মিথ্যা বলা উচিত নয়

ভেবে সঠিক পরিচয়ই দিল যুবক, "আমি সৌবীররাজের পুত্র অবিমারক।"

"এখানে এই নির্জন পাহাড়ে একাকী কি হেতু আগমন?" বিদ্যাধরের এই প্রশ্নে অধোমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল সে। মেঘনাদ তখন তার বিদ্যাধরসুলভ বিদ্যাবলে অবিমারকের সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারল। অগ্নির অংশে জাত আত্মবিস্মৃত এই যুবকের জন্য তার আন্তরিক সহানুভূতি হলো। মুশকিল আসান করতে সে যুবককে একটি আশ্চর্য আংটি দিল। আংটির মাহাত্ম্য এই যে ডান হাতের আঙ্গুলে পরলে অদৃশ্য হওয়া যায়; আবার, বাঁ হাতের আঙুলে পড়লে নিজরূপ ফিরে পাওয়া যায়। আংটির এই আশ্চর্য ক্ষমতার চাক্ষুষ প্রমাণও বিদ্যাধর দেখিয়ে দিল। আর, খুশি হয়ে বিদ্যাধর তাকে একটি অত্যুজ্জ্বল খড়্গও উপহার দিল। তারপর, আর দেরি না করে বিদ্যাধর দম্পতি উঠল আকাশে, যুবককে জানিয়ে গেল অফুরন্ত শুভেচ্ছা।

এবার অবিমারকের নগরে ফেরার পালা। সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই, একা একা আর ভাল লাগে না, বিশেষ করে, হাতের মুঠোয় যখন তার এক আশ্চর্য আংটি, তখন সেকথা শোনাবার মতো কাউকে যে পাচ্ছে না। এদিকে অবিমারকের বয়স্য সন্তুষ্ট তার সন্ধানে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক শুভদিনে পথের মাঝেই দেখা হলো দু'জনের। গাঢ় আলিঙ্গনে পরস্পর আবদ্ধ হলো তারা। সন্তুষ্টকে বলল অবিমারক তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

বিদ্যাধরের দেওয়া আংটি ডান হাতের আঙুলে পরে সে সন্তুষ্টের চোখের সামনে হারিয়ে গেল, সেটিকে আবার বাঁ হাতের আঙুলে পরে তক্ষুনি সশরীরে সন্তুষ্টের সম্মুখে হাজির হলো। দেখে তো সন্তুষ্টের মুখে 'রা' সরে না। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সে বলল, "তবে আর বিলম্ব কেন? শুভস্য শীঘ্রম্।" হ্যাঁ, আংটির জোরেই সবার চোখের সামনে দিনদুপুরেই তারা ঢুকে পড়ল সেই কন্যান্তঃপুরে—যার চতুর্দিকে রক্ষীদের অতন্দ্র প্রহরা। সন্তুষ্ট তো প্রথমে ভাবতেই পারে নি যে

সেও অমনিভাবে কন্যান্তঃপুরে ঢুকতে পারবে। কিন্তু ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছে তার বীর সখা ; সে তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে বয়স্যকে এমন করে জড়িয়ে রেখেছে যে, আংটির ছোঁয়ার গুণে সে তার বয়স্যকেও অদৃশ্য করে নিয়েছে একই সঙ্গে। সে যা হোক্, এবার চুপিচুপি দেখা যাক কুরঙ্গী কোথায়।

আকাশে সেদিন নববর্ষার ঘনঘটা। দীর্ঘ বিরহে কুরঙ্গীর অবস্থা অতীব সঙ্গীন। তার উপর, এ ঘন বাদর। বাঁচার কোনো আশা তার নেই। সবার সজাগ দৃষ্টি তাকে ঘিরে, তাই তার মরবারও কোনো পথ নেই। কী করা যায়! সখীকে ডেকে বলল সে, "আজ আমার কেমন সাধ হচ্ছে—নববর্ষার ধারাজলে স্নান করি। আন না সখী আমার স্নান-সামগ্রী।" তাই নলিনিকা গেছে স্নানের উপকরণ আনতে। হরিণিকাকে পাঠিয়েছে রাজকন্যা তার মাতার কাছে—আজ যে তার শরীর ভাল আছে সেটা জানাতে। অতএব এই দুর্লভ মুহূর্তে রাজকন্যা একান্তই একা। অলক্ষ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অবিমারক যে এসে গেছে এবং তাকে নিবিড়ভাবে দেখছে, সে কথা কুরঙ্গী জানবে কেমন করে?

অবিমারকের উৎসুক দৃষ্টির সামনে কুরঙ্গীর কৃশদেহ বারবার উষ্ণ-শ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। অস্থির নয়নে নিজের চারপাশে সে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। দু'গাল বেয়ে ঝরছে তার বেদনার অশ্রু। এই তো মৃত্যুর পরম লগ্ন। উত্তরীয়ই হবে তার উদ্বন্ধনের রজ্জু। তাই উত্তরীয় হাতে করে উঠে দাঁড়াল সে। সঙ্গে সঙ্গে কড়্ কড়্ কড়াৎ শব্দে মেঘ ডাকল আকাশে। ভয়ে কুরঙ্গী আর্তনাদ করে উঠল, "বাঁচাও, কে আছ—বাঁচাও।" আত্মপ্রকাশের এই তো সুবর্ণ সুযোগ ; অবিমারক সঙ্গে সঙ্গে আংটিটি তার বাঁ হাতে পরে নিল। নিজরূপ ফিরে পেয়ে "ভয় নেই, ভয় নেই", বলে সে কুরঙ্গীর সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে কুরঙ্গীর তো বিস্ময়ের সীমা নেই। কি করবে—সে ঠিক করতে পারে না। আর যাই করুক, মরতে সে আর চায় না। দয়িতকে দেখে মুহূর্তেই সব জ্বালা তার জুড়িয়ে গেছে। সন্তুষ্ট ইতিমধ্যে কুরঙ্গীর সখী

মহলে গিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে ; আসর জমিয়ে সে তাদের কন্যান্তঃপুরে ঢোকার গল্প মজা করে শোনাচ্ছে। সুতরাং এখন নিভৃতে শুধু দুজন মুখোমুখি বসে—কুরঙ্গী আর অবিমারক ; দুজনে দুজনকে মুগ্ধ চোখে দেখছে আর দেখছে। দেখতে দেখতে দুজনেরই চোখ বেয়ে নামল ধারা—। বাইরে তখন অবিরাম বর্ষণ।

কুন্তিভোজ পড়েছেন উভয়-সংকটে। কুরঙ্গীর বয়স যখন অল্প, তখন থেকেই সৌবীররাজ তাকে পুত্রবধূরূপে মনোনীত করে রেখেছেন। আপত্তি ছিল না কারোই। কিন্তু রাজকন্যার যখন বিয়ের বয়স হলো, তখন তাঁর কোনো পাত্তাই নেই। অগত্যা কাশীরাজের পুত্রের সঙ্গেই কুরঙ্গীর সম্বন্ধ স্থির করা হয়েছে। কাশীরাজের মহিষী সুদর্শনা স্বয়ং পুত্র জয়বর্মাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এসেছেন। অনিবার্য কারণে কাশীরাজ এখনই আসতে পারছেন না। শুভ দিনক্ষণ সব দেখা হয়ে গেছে।

এরই মধ্যে সৌবীররাজের রাজধানী থেকে দূত এসে এক অভিনব বৃত্তান্ত শুনিয়ে গেল—চর মাধ্যমে জানা গেছে, সৌবীররাজ সপরিবারে কুন্তিভোজের রাজধানীতেই বসবাস করছেন।

শোনা মাত্র কুন্তিভোজ ভূতিককে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তাঁর সন্ধানে। অচিরেই দেখা হলো দু সখার। গাঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁরা। দীর্ঘ উৎকণ্ঠা ও অদর্শনের শেষে এ মিলন বড় মধুর। কিন্তু কেন এভাবে সবাইকে ভোগালেন তিনি ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন সৌবীররাজ, "চণ্ডভার্গব নামে এক অতি-রাগী মুনির এক শিষ্য বাঘের হাতে মারা পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত তখন আমি সেই বনে শিকারে গিয়েছিলাম। মুনি তাঁর শিষ্যের মৃত্যুর জন্য আমাকেই দায়ী করলেন। আমার কোনো কথায় তিনি আদৌ কর্ণ-পাত করলেন না ; যা খুশি গালমন্দ করে চললেন। আমি সহ্য করতে না পেরে বলে ফেললাম, আপনার এই অহেতুক ক্রোধ দেখে মনে হয়, আপনি মুনি নন, চণ্ডাল।"

আর যান কোথা, সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ দিলেন মুনি, 'চণ্ডাল বললি আমাকে, তবে রে হতভাগা! যা, তুই নিজে সপরিবারে চণ্ডাল হ।' ঘটনা যে এতদূর গড়াবে, বুঝিনি। পায়ে পড়লাম তাঁর। অনেক অনুনয়-বিনয় করার পর রাগ কিছুটা নামল। বললেন, 'যা, একবছর গোপনে চণ্ডাল রূপে বসবাস কর, তা হলেই তোর শাপমুক্তি হবে।' আজ আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত শাপমুক্তির দিন। তাই তো গোপন আবাস ছেড়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলাম।"

আজ বড় আনন্দের দিন। তবু তারি মধ্যে বিষাদের সানাই বাজে—বাজে পুত্র-হারা পিতা সৌবীররাজের হৃদয়ের অন্তস্তলে। এক বছর হয়ে গেল, সৌবীররাজের পুত্র অবিমারক নিরুদ্দেশ। অমাত্য ভূতিক দায়িত্ব নিলেন— অবিমারককে খুঁজে বের করবেন। কুন্তিভোজ জানতে চান,—"অবিমারক কোন পুত্রের নাম? আমি তো জানতাম বিষ্ণুসেনই আপনার একমাত্র পুত্র?" অমাত্য ভূতিক ব্যাপারটা খুলে বললেন, "ধূমকেতু নামে এক অসুর একবার সৌবীর-রাজ্যে খুব অত্যাচার শুরু করল। দিনকে দিন তার অত্যাচারের মাত্রা গেল বেড়ে। সারা রাজ্যে বিভীষিকা। কোনো মতেই কেউ যখন অসুরকে শায়েস্তা করতে পারল না, তখন কুমার বিষ্ণুসেন এক-দিন খেলার ছলে গিয়ে হাজির সেই অসুরের আস্তানায়। তার সারা গায় ধূলোবালি। কুমারকে দেখে অসুর তো আহ্লাদে আটখানা, বহুদিন এমন সরেস শিকার তার জোটেনি। সুমুখে সাজান খাবার দেখে অসুর ধীরে সুস্থে এগিয়ে এল তার দিকে। শুরু হলো খাদ্য—খাদকের অদ্ভুত লড়াই। মেষরূপধারী অসুর শত চেষ্টা করেও কুমারের বাহুবলের কাছে দাঁড়াতে পারল না। আঘাতে আঘাতে ধরাশায়ী করে কুমার নিহত করল সেই অসুরকে। 'অবি' রূপধারী অসুরকে হত্যা করায় তখন থেকে কুমার বিষ্ণুসেন 'অবিমারক' নামে খ্যাত হলো।"

কিন্তু হায়! আজ কোথায় সেই দুর্জয় বীর অবিমারক? হাজার

গুপ্তচরেও তার কোনো সন্ধান দিতে পারছে না !

এ হেন সংকটে সবাই যখন বিব্রত, তখন সহসা শোনা গেল কার বীণার শব্দ। চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখল সবাই—দেবর্ষি নারদ নেমে আসছেন আকাশ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পাদপূজার আয়োজন করা হলো। পাদ্যার্ঘ্যে সন্তুষ্ট দেবর্ষি জানালেন, "অবিমারকের অদর্শন জনিত সমস্যার সমাধান করতেই আমার আসা। ভেব না, অবিমারক ভাল আছে।" সৌবীররাজ জিজ্ঞেস করেন—"কুমার কি কারণে আত্মপ্রকাশ করছে না ?"

দেবর্ষি বলেন, "কারণ-? কারণ তার বিবাহই বটে।"

কুন্তিভোজ বলেন, "বিবাহ ? কুমার বিষ্ণুসেনের বিবাহ হয়ে গেছে, বলছেন ? কোথায় কার জামাতা হয়ে আছে সে ?"

সবাইকে স্তম্ভিত করে বললেন ঋষি, "বৈরন্ত্য নগরে কুরঙ্গীর পিতা ভাগ্যবান কুন্তিভোজের জামাতা হয়ে আছে সে।"

বিস্ময়ের পর বিস্ময়। সবার অনুরোধে দেবর্ষি একে একে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন। নববধূ সহ অবিমারককে কন্যান্তঃপুর থেকে সসম্মানে নিয়ে আসারও তিনি আদেশ দিলেন।

কুন্তিভোজ প্রশ্ন করেন, "এ বিবাহ কি অগ্নিসাক্ষী রেখে অনুষ্ঠিত হয়েছে ?"

নারদ উত্তর দেন, "বিষ্ণুসেনের সকল কাজের সাক্ষীই তো ভগবান অগ্নি, কারণ অগ্নিদেবের অংশেই তার জন্ম। তবুও যদি চাও, বন্ধুজনের পরিতুষ্টির জন্য মাঙ্গলিক কিছু একটা কর।"

কিন্তু এখন জয়বর্মার কি হবে ? সে সমাধানও দেবর্ষি বলে দিলেন, "শোন সুদর্শনা, তোমার ভগ্নী সৌবীররাজের পত্নী সুচেতনার সন্তান প্রসবকালেই মারা গেলে, তুমি অগ্নির অংশে জাত তোমার প্রথম পুত্রকে তার কাছে দান করেছিলে, স্মরণ আছে তো ? এই বিষ্ণুসেন বা অবিমারক হলো তোমার সেই প্রথম পুত্র। সুতরাং কুরঙ্গী তোমারই জ্যেষ্ঠ পুত্রের বধূ হলো। জয়বর্মার সঙ্গে তার বিবাহের কথা এখন

উঠতেই পারে না, সে যে জয়বর্মার পূজ্যা। তবে হ্যাঁ, জয়বর্মার হতাশ হবারও কিছু নেই। কুন্তিভোজের কনিষ্ঠা কন্যা সুমিত্রা রয়েছে, সেও দুদিন পরে বিবাহ-যোগ্যা হবে। দিদির মতো না হলেও, রূপ-গুণ তারও কিছু কম নয়। তাছাড়া, বয়সের দিক থেকে জয়বর্মার সঙ্গে তাকে মানাবেও ভারি সুন্দর।"

ইতিমধ্যে প্রাসাদ থেকে নেমে এল নব বরবধূ—অবিমারক ও কুরঙ্গী। হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হলো রাজপুরী। নবদম্পতি একে একে দেবর্ষি ও গুরুজনদের পদধূলি নিল। দেবর্ষি ও গুরুজনেরা তাদের পরম আদরে সম্ভাষণ করলেন, উচ্চারণ করলেন সুমধুর আশীর্বাণী। বন্ধু-বান্ধব ও পরিজনেরা স্বতঃস্ফূর্ত শুভেচ্ছায় অভিনন্দিত করল রাজ-কন্যা ও রাজজামাতাকে। এরপর শুরু হলো পরস্পর অন্তরঙ্গ সংলাপ। এমনিভাবে সবার আশীর্বাদ ও ভালবাসা নিয়ে নবদম্পতি শুরু করল তাদের নূতন জীবন॥

স্বপ্ন বাসবদত্তা

স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়

পৃথিবীর বুকে বৎসরাজ্যটি ছিল স্বর্গেরই মতো সুন্দর, যেন স্বর্গের গর্ব খর্ব করার জন্যই বিধাতা সৃষ্টি করেছিলেন এই দেশটি। আর বৎসরাজ্যের ঠিক মাঝখানে ছিল তার রাজধানী কৌসাম্বী। কী মনোহর ছিল সেই নগরী, যেন ধরিত্রীদেবীর সব সেরা গহনাটি। এই রাজ্য শাসন করেছেন পৃথিবীবিখ্যাত সব বীর, জগতের সেরা রাজন্যবর্গ। যে সময়ের কথা তখন এই বংশের রাজা ছিলেন উদয়ন। রাজা সহস্রানীকের পুত্র উদয়ন। শরীরে যখন জরার লক্ষণ দেখা দিল,মহারাজ সহস্রানীক উপযুক্ত সন্তানকে সিংহাসনে বসিয়ে রানীকে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের পথে যাত্রা করলেন।

কুমার উদয়ন তখন সদ্য যুবক। কিন্তু রাজ্যশাসনের ভার হাতে পেয়ে তিনি বিচলিত হলেন না মোটেই, পিতার মতোই নিপুণভাবে প্রজাপালন আর রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। প্রজারাও তাঁকে মানত তাঁর পিতার মতোই। ভক্তিও করত, ভয়ও পেত।

রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে রাজা যেতেন শিকারে। বড় ভালবাসতেন তিনি মৃগয়া করতে। বীণা বাজাতেন তিনি, বীণা বাজান ছিল তাঁর নেশা। উদয়নের জন্ম হয়েছিল তপোবনে, বাল্য-কাল কেটেছিল তাঁর বনের মধ্যেই। সেই সময়ে একবার একটি সাপকে তিনি রক্ষা করেছিলেন এক শবরের হাত থেকে। সেই সাপটি আর কেউ নয় স্বয়ং বাসুকীর ভাই বসুনেমি। কৃতজ্ঞ বসুনেমি

তাঁকে একটি বীণা উপহার দিলেন। সুমধুর তার ঝঙ্কার। উদয়ন যখন বীণাটি বাজাতেন বনে গিয়ে, তখন বুনো হাতীর দল তাদের খাওয়া ফেলে, খেলা ভুলে ভিড় করত রাজার আশে পাশে। মুগ্ধ হয়ে শুনত বীণার সেই অপরূপ ধ্বনি, চিরকালের জন্য তারা তাঁর বাধ্য হয়ে যেত। আর উদয়নও এই বুনো হাতী বশ করার নেশায় যেন পাগলের মতো হয়ে উঠতেন, দিনের পর দিন বীণা হাতে নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন নাওয়া-খাওয়া ভুলে।

এইভাবে সুখেই দিন কাটছিল তাঁর। কোনোদিকে তাঁর কোনো চিন্তা ছিল না। শুধু একটি দুশ্চিন্তায় মাঝে সাঝে মন ভার হত তাঁর। সদ্য যুবক উদয়নের বিবাহ হয়নি তখনও। তিনি যেমন রূপবান ছিলেন তেমনই ছিলেন বীর। আর কত যে গুণ ছিল তাঁর! এমন যে রাজা তাঁর উপযুক্ত রানী কোথায় পাওয়া যায়? রূপে এবং গুণে, কুলে আর শীলে তাঁরই সমান হবে এমন কন্যা পৃথিবীতে ছিল দুর্লভ। জগতে শুধু একটি মাত্র কন্যাই রাজার যোগ্য ছিল—উজ্জয়িনীর রাজা মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা। কিন্তু উজ্জয়িনীর সঙ্গে বৎসরাজ্যের চিরকালের শত্রুতা। তাই উদয়নের সঙ্গে বাসবদত্তার বিয়ে হওয়া অসম্ভব। অথচ বাসবদত্তা ছাড়া আর কে-ই বা তাঁর রানী হতে পারে। রাজা এবং মন্ত্রীদের তাই একমাত্র চিন্তা ছিল কি উপায়ে, কোন কৌশলে বাসবদত্তাকে বৎসরাজ্যের রানী করা যায়। কিন্তু এই চিন্তা যে শুধু তাদের মনেই ছিল তা নয়। উজ্জয়িনীর রাজা মহাসেনও মহাভাবিত হয়ে উঠেছেন। বাসব অর্থাৎ ইন্দ্রের অনুগ্রহে তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর কন্যাকে। সেইজন্য তাঁর নাম বাসবদত্তা। চন্দ্রের চেয়েও রূপবতী সেই রাজকন্যা—রূপে, গুণে অতুলনীয়া। সারা পৃথিবী ঘুরেও তাঁর কন্যার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যায় নি। একমাত্র উদয়নই তাঁর স্বামী হবার যোগ্য। কিন্তু তিনি তো চিরশত্রু। তাঁকে কি করেই বা তিনি জামাই করবেন। তাঁকে বিবাহের জন্যে প্রস্তাব পাঠালে হয়ত সেই প্রস্তাব তিনি অগ্রাহ্য

করতে পারেন।

মহাসেন বুঝলেন কৌশলে উদয়নকে বন্দী করে উজ্জয়িনীতে নিয়ে আসতে হবে। রাজকুমারীকে একবার দেখলে উদয়ন যে মুগ্ধ হবেন এবং তাকে বিবাহ করতে সম্মত হবেন সে বিষয়ে মহারাজের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। কিন্তু কি উপায়ে, কোন কৌশলে বৎসরাজকে বন্দী করা যায়। অনেক চিন্তা করে, পাত্রমিত্রদের সঙ্গে বহু পরামর্শ করে অবশেষে রাজা একটি উপায় বার করলেন। উদয়ন যে একজন দক্ষ বীণাবাদক ছিলেন সে কথা তাঁদের সকলেরই জানা ছিল আর বীণা বাজিয়ে, বীণার সুরে হাতীকে বশ করতে তাঁর যে ভারী আনন্দ ছিল একথাও লোকমুখে শুনেছিলেন তাঁরা। রাজা এবং তার বুদ্ধিমান ও কৌশলী মন্ত্রীরা উদয়নকে বন্দী করার জন্য ভারী অদ্ভুত একটি কাজ করলেন। সুনিপুণ যন্ত্রীদের দিয়ে তৈরি করানো হলো বিশাল এক কাঠের হাতী। সেই হাতীর মধ্যে লুকিয়ে রইল বাছাই করা একদল দুঃসাহসী যোদ্ধা। বৎসরাজ্যের সীমানায় গভীর বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হলো সেই যন্ত্রহস্তীকে। দেখে মনে হলো যেন ইন্দ্রের ঐরাবতের মতোই বিশাল এক বন্যগজ দাঁড়িয়ে আছে বনের ধারে। রাজা উদয়নের অনুচরেরা দূর থেকে সেই বিশাল মায়াগজটিকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তাঁকে বলল, মহারাজ ছোটখাট পাহাড়ের মতো দেখতে বিরাট একটি হাতী ঐ বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে এলাম। এমন বড় হাতী আগে আর কখনও দেখিনি। রাজা ভারী খুশি হলেন। অনেক পুরস্কার দিয়ে বিদায় করলেন তিনি অনুচরদের।

পরদিন প্রত্যূষেই রাজা যাত্রা করলেন সেই বনের দিকে। সেই হাতীটিকে ধরার জন্য ভারী উৎসুক তখন তাঁর মন। সঙ্গের সৈন্যসামন্ত-দের বনের বাইরে রেখে কয়েকটি মাত্র অনুচর নিয়ে তিনি বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর তার বীণাটি হাতে নিয়ে বাজাতে বাজাতে একাই অগ্রসর হলেন সেই বন্য হাতীর দিকে। বনের মধ্যে বড় বড় গাছের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে আর রাজার মন মগ্ন হয়ে আছে

বীণার সঙ্গীতে, তাই তিনি বুঝতে পারলেন না হাতীটি জীবন্ত নয়। তিনি তখন ভাবছিলেন কিভাবে বশ করবেন হাতীটিকে, কেমন করে বেঁধে নিয়ে যাবেন তাকে—এইসব। নিজের ভাবনাতেই বিভোর ছিলেন তিনি, বুঝতেও পারেন নি কখন কাঠের হাতীর পেট থেকে সৈন্যরা বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরেছে তাঁকে। ঘোর যখন কাটল, তখন তিনি ক্ষিপ্রবেগে ছুরিহাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাদের ওপর। কিন্তু পেছন থেকেও সৈন্যরা তাঁকে ধরে ফেলল। অগণিত সৈন্যদল আর তিনি একা—কতক্ষণ তিনি পারবেন ? কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে রণে ভঙ্গ দিতে হলো। তিনি বন্দী হলেন।

চণ্ডমহাসেনের সৈন্যরা শৃঙ্খলিত অবস্থায় উদয়নকে নিয়ে এল উজ্জয়িনীতে। কিন্তু সেই বন্দী অবস্থাতেও তাঁর সেই সুন্দর বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা দেখে নগররক্ষীরা সকলেই বুঝল, এই বন্দী কোনো সাধারণ লোক নন্, রাজবংশেই নিশ্চয় এর জন্ম। তারা মহারাজকে অনুরোধ করল বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে। রাজা মহাসেন উদয়নের সঙ্গে অত্যন্ত সম্মানজনক ব্যবহার করলেন। তিনি তাকে বুঝতেই দিলেন না যে তিনি বন্দী। একজন রাজার মতোই তিনি তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আর তিনি উদয়নের পরিচর্যার ভার অর্পণ করলেন তাঁর অপূর্ব সুন্দরী কন্যা বাসবদত্তার ওপর। উদয়নকে তিনি অনুরোধ করলেন বাসদবত্তাকে বীণা বাজানো শিক্ষা দিতে। চণ্ডমহাসেন স্থিরনিশ্চিত ছিলেন তাঁর কন্যাকে একবার দেখলে উদয়ন তাকে ভাল না বেসেই পারবেন না। রাজার ধারণাই ঠিক হলো। কিন্তু শুধু উদয়নই রাজকন্যাকে দেখে মুগ্ধ হলেন না, রাজকন্যাও প্রথম দর্শনেই রাজাকে পছন্দ করে ফেললেন। খুব ভালবাসা হলো দু'জনের মধ্যে।

উজ্জয়িনীতে উদয়ন রাজকন্যা বাসবদত্তার একনিষ্ঠ সেবায় ও যত্নে সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন। রাজকন্যাকে বীণা শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে দুজনে দুজনকে আরও ভাল করে জানার সুযোগ পেলেন এবং তাদের ভালবাসা আরও গভীর হলো। বন্দীজীবন মাঝে মাঝে রাজাকে

অস্থির করে তুললেও তিনি এই ভেবে মনকে শান্ত করতেন যে তাঁর সুচতুর ও সুযোগ্য মন্ত্রীরা তাঁকে বেশিদিন এই অবস্থায় থাকতে দেবেন না। যেভাবেই হোক তাঁকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন। হলোও তাই। কিছুদিনের মধ্যেই রুমণ্বান নামে রাজার এক মন্ত্রী ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হলেন এবং কৌশলে রাজা উদয়নের সঙ্গে দেখা করলেন। বাসবদত্তাও তখন তাঁর ভাবী স্বামীকে সাহায্য করতে চাইলেন। তাঁরা তিনজন পরামর্শ করে পরদিন সব মাহুতদের প্রচুর মদ্য পান করিয়ে দিলেন। এবং তারা সকলেই মত্ত হয়ে পড়ল। তখন উদয়ন তাঁর বীণা এবং অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিলেন এবং বাসবদত্তার সঙ্গে উজ্জয়িনী রাজের বিখ্যাত হাতী ভদ্রাবতীর ওপর আরোহণ করে গোপনে উজ্জয়িনী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। উদয়ন সোজা নিজের রাজ্যে নিয়ে গেলেন বাসবদত্তাকে। তাঁদের দুজনেরই ভয় ছিল, চণ্ড-মহাসেন নিশ্চয় খুবই রেগে যাবেন আর কঠিন শাস্তি দেবেন তাঁদের দুজনকে। কিন্তু উজ্জয়িনীরাজ তো তাঁর মেয়ের সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দেবার জন্য উৎসুক হয়েই ছিলেন। তাই তিনি এই ঘটনায় রাগ তো করলেনই না বরং তার কৌশল যে এমনভাবে কার্যকর হয়েছে তাতে ভারী খুশি হলেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুত্র গোপালককে কৌশাম্বী পাঠিয়ে দিলেন। রাজপুত্র কৌশাম্বী গিয়ে নিজেই ভগিনীকে বৎসরাজের হাতে সম্প্রদান করলেন।

এতদিন ধরে যাকে মহিষীরূপে কামনা করছিলেন সেই সুন্দরী গুণবতী বাসবদত্তাকে রাজা অবশেষে লাভ করলেন। আর বাসবদত্তাও পেলেন বীরশ্রেষ্ঠ রাজা উদয়নকে। বড় সুখী হলেন তাঁরা। দুজন দুজনের চোখের দিকে চেয়ে যেন ভুলে গেলেন সমস্ত পৃথিবীটাই। রাজা উদয়ন ভুলে গেলেন তাঁর রাজকার্য, শত্রুদের দমন করতে হবে সেকথাও ভুলে গেলেন তিনি। সর্বক্ষণ রানীর সাহচর্যেই কাটে তাঁর দিন। নয়ত পানাহারে মত্ত হয়ে থাকেন তিনি আবার কখনও বেরিয়ে পড়েন মৃগয়ায়। এইভাবে একেবারেই বদলে গেলেন প্রজাপালক

রাজা উদয়ন। প্রজাদের মঙ্গলচিন্তা আর রইল না তাঁর মনে।

রাজার মন্ত্রীরা কিন্তু ছিলেন তাঁর অনুগত। রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁরা। রাজার এই পরিবর্তনে তাঁরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের ভয় হলো, এরকম জীবনযাপন করলে রাজা উদয়ন তাঁর সিংহাসন, রাজত্ব সবই হারাবেন। তাই তাঁরা সকলে মিলে অনেক আলোচনা, অনেক পরামর্শ করলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন রাজা এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আছেন, অচেতন মানুষের মতো। না হলে কি একজন দায়িত্বশীল নরপতি এভাবে বিলাস-ব্যসনে, আমোদে-প্রমোদে মৃগয়ায় কালহরণ করেন? তাঁরা ঠিক করলেন রাজার দায়িত্ব সম্পর্কে উদয়নকে সচেতন করে তুলবেন সবাই। কিন্তু কি উপায়ে সেটা সম্ভব! দারুণ কোনো মানসিক আঘাতই হয়ত তাঁকে বদলে দিতে পারবে। আর রাজার পক্ষে সবচেয়ে বড় আঘাত কি হতে পারে। তাঁর নয়নের মণি, তাঁর প্রাণের প্রাণ, তাঁর আদরের মহিষীর মৃত্যু সংবাদই তাঁকে সব থেকে বেশি কষ্ট দেবে। অতএব তাঁরা ঠিক করলেন মহারানীর মৃত্যুসংবাদ, হোক তা মিথ্যে, শোনাতে হবে রাজাকে। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদই একমাত্র রাজাকে সচেতন করে তুলবে। কিন্তু মহারানীর সাহায্য ছাড়া এই মিথ্যে খবর রাজা উদয়নকে জানানো তো সম্ভব নয়।

তাঁরা সকলে গেলেন বাসবদত্তার কাছে। তিনি সব শুনলেন— রাজা ভুলেছেন রাজকার্য, সাম্রাজ্য রক্ষা অথবা বিস্তারেও আর আগ্রহ নেই তাঁর। রাজার সব দায়িত্বের কথাই তিনি ভুলেছেন মহিষীর মুখের দিকে তাকিয়ে। সর্বক্ষণ তাঁরই সাহচর্য পাবার আশায়। এই সংবাদে দুঃখ পেলেন বাসবদত্তা। তিনি তো শুধু রাজার রানীই নন, প্রজাদেরও তিনি রানী। তিনি প্রজাপালিকা। রাজা যদি প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা না করেন, তাহলে তাঁকেই ভাবতে হবে তাদের জন্য। রাজার মঙ্গলের কথাও চিন্তা করতে হবে তাঁকে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন মন্ত্রীদের প্রস্তাবে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, যুক্তি

অস্থির করে তুললেও তিনি এই ভেবে মনকে শান্ত করতেন যে তাঁর সুচতুর ও সুযোগ্য মন্ত্রীরা তাঁকে বেশিদিন এই অবস্থায় থাকতে দেবেন না। যেভাবেই হোক তাঁকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করবেন। হলোও তাই। কিছুদিনের মধ্যেই রুমণ্বান নামে রাজার এক মন্ত্রী ছদ্মবেশে উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হলেন এবং কৌশলে রাজা উদয়নের সঙ্গে দেখা করলেন। বাসবদত্তাও তখন তাঁর ভাবী স্বামীকে সাহায্য করতে চাইলেন। তাঁরা তিনজন পরামর্শ করে পরদিন সব মাহুতদের প্রচুর মদ্য পান করিয়ে দিলেন। এবং তারা সকলেই মত্ত হয়ে পড়ল। তখন উদয়ন তাঁর বীণা এবং অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিলেন এবং বাসবদত্তার সঙ্গে উজ্জয়িনী রাজের বিখ্যাত হাতী ভদ্রাবতীর ওপর আরোহণ করে গোপনে উজ্জয়িনী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কেউ তাঁকে বাধা দিল না। উদয়ন সোজা নিজের রাজ্যে নিয়ে গেলেন বাসবদত্তাকে। তাঁদের দুজনেরই ভয় ছিল, চণ্ড-মহাসেন নিশ্চয় খুবই রেগে যাবেন আর কঠিন শাস্তি দেবেন তাঁদের দুজনকে। কিন্তু উজ্জয়িনীরাজ তো তাঁর মেয়ের সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দেবার জন্য উৎসুক হয়েই ছিলেন। তাই তিনি এই ঘটনায় রাগ তো করলেনই না বরং তার কৌশল যে এমনভাবে কার্যকর হয়েছে তাতে ভারী খুশি হলেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পুত্র গোপালককে কৌশাম্বী পাঠিয়ে দিলেন। রাজপুত্র কৌশাম্বী গিয়ে নিজেই ভগিনীকে বৎসরাজের হাতে সম্প্রদান করলেন।

এতদিন ধরে যাকে মহিষীরূপে কামনা করছিলেন সেই সুন্দরী গুণবতী বাসবদত্তাকে রাজা অবশেষে লাভ করলেন। আর বাসবদত্তাও পেলেন বীরশ্রেষ্ঠ রাজা উদয়নকে। বড় সুখী হলেন তাঁরা। দুজন দুজনের চোখের দিকে চেয়ে যেন ভুলে গেলেন সমস্ত পৃথিবীটাই। রাজা উদয়ন ভুলে গেলেন তাঁর রাজকার্য, শত্রুদের দমন করতে হবে সেকথাও ভুলে গেলেন তিনি। সর্বক্ষণ রানীর সাহচর্যেই কাটে তাঁর দিন। নয়ত পানাহারে মত্ত হয়ে থাকেন তিনি আবার কখনও বেরিয়ে পড়েন মৃগয়ায়। এইভাবে একেবারেই বদলে গেলেন প্রজাপালক

রাজা উদয়ন। প্রজাদের মঙ্গলচিন্তা আর রইল না তাঁর মনে।

রাজার মন্ত্রীরা কিন্তু ছিলেন তাঁর অনুগত। রাজার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন তাঁরা। রাজার এই পরিবর্তনে তাঁরা খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁদের ভয় হলো, এরকম জীবনযাপন করলে রাজা উদয়ন তাঁর সিংহাসন, রাজত্ব সবই হারাবেন। তাই তাঁরা সকলে মিলে অনেক আলোচনা, অনেক পরামর্শ করলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন রাজা এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে আছেন, অচেতন মানুষের মতো। না হলে কি একজন দায়িত্বশীল নরপতি এভাবে বিলাস-ব্যসনে, আমোদে-প্রমোদে মৃগয়ায় কালহরণ করেন? তাঁরা ঠিক করলেন রাজার দায়িত্ব সম্পর্কে উদয়নকে সচেতন করে তুলবেন সবাই। কিন্তু কি উপায়ে সেটা সম্ভব! দারুণ কোনো মানসিক আঘাতই হয়ত তাঁকে বদলে দিতে পারবে। আর রাজার পক্ষে সবচেয়ে বড় আঘাত কি হতে পারে। তাঁর নয়নের মণি, তাঁর প্রাণের প্রাণ, তাঁর আদরের মহিষীর মৃত্যু সংবাদই তাঁকে সব থেকে বেশি কষ্ট দেবে। অতএব তাঁরা ঠিক করলেন মহারানীর মৃত্যুসংবাদ, হোক তা মিথ্যে, শোনাতে হবে রাজাকে। এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদই একমাত্র রাজাকে সচেতন করে তুলবে। কিন্তু মহারানীর সাহায্য ছাড়া এই মিথ্যে খবর রাজা উদয়নকে জানানো তো সম্ভব নয়।

তাঁরা সকলে গেলেন বাসবদত্তার কাছে। তিনি সব শুনলেন—রাজা ভুলেছেন রাজকার্য, সাম্রাজ্য রক্ষা অথবা বিস্তারেও আর আগ্রহ নেই তাঁর। রাজার সব দায়িত্বের কথাই তিনি ভুলেছেন মহিষীর মুখের দিকে তাকিয়ে। সর্বক্ষণ তাঁরই সাহচর্য পাবার আশায়। এই সংবাদে দুঃখ পেলেন বাসবদত্তা। তিনি তো শুধু রাজার রানীই নন, প্রজাদেরও তিনি রানী। তিনি প্রজাপালিকা। রাজা যদি প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা না করেন, তাহলে তাঁকেই ভাবতে হবে তাদের জন্য। রাজার মঙ্গলের কথাও চিন্তা করতে হবে তাঁকে। তিনি রাজী হয়ে গেলেন মন্ত্রীদের প্রস্তাবে। তাঁরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে, যুক্তি

করে যে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন বাসবদত্তা নির্বিবাদে মেনে নিলেন সে সিদ্ধান্ত। হয়ত বহুদিনের জন্য মহারাজকে ছেড়ে থাকতে হবে, অনেক দূরে চলে যেতে হবে তাঁকে। একথা ভেবে তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছিল। তবু তিনি সব দ্বিধা, সব দ্বন্দ্ব জোর করে সরিয়ে দিলেন মন থেকে, মহারাজ উদয়নের মঙ্গলের কথা ভেবেই।

এবার নিজেদের মধ্যে জল্পনা করে যৌগন্ধনারায়ণ, রুমন্বান প্রভৃতি মন্ত্রীরা ঠিক করলেন, রাজা ও রানীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা সকলেই লাবাণক গ্রামে যাবেন। প্রায় মগধরাজ্যের সীমানার কাছে লাবাণক গ্রাম, কাছেই বিশাল অরণ্যভূমি। বন-জঙ্গল দেখলেই রাজা শিকার করতে প্রলুব্ধ হবেন। মন্ত্রীরা স্থির করলেন, রাজা মৃগয়ায় গেলেই তাঁরা লাবাণকে রাজার উদ্যানগৃহের অন্তঃপুরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চারিদিকে প্রচার করে দেবেন—আগুনে দগ্ধ হয়ে মহিষীর মৃত্যু হয়েছে। এরপর বাসবদত্তা ও যৌগন্ধনারায়ণ দুজনে ছদ্মবেশ ধরে যাবেন মগধে। সেখানে মন্ত্রী কৌশলে মহারানীকে মগধরাজ দর্শকের বোন রাজকন্যা পদ্মাবতীর আশ্রয়ে রেখে আসবেন। তাঁদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হলে পরে এক সময় তাঁরা আবার বাসবদত্তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন কৌশাম্বীতে।

মন্ত্রীদের এই প্রস্তাবও বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলেন বাসবদত্তা। এর জন্য যে তাঁকে অবহেলা অনাদর এমনকি অপমানও সহ্য করতে হবে, এমন আশঙ্কা তাঁর মনে জাগলেও সেই কথা তিনি কাউকেই জানালেন না।

রাজা উদয়নের কাছে লাবাণক ভ্রমণের প্রস্তাব করতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। লাবাণকের নিভৃতে উদ্যানগৃহে মহিষীর সান্নিধ্যে তিনি কদিন আনন্দে কাটাবেন আর মৃগয়া করবেন গভীর অরণ্যে—এই চিন্তায় তাঁর লাবাণক যাবার আগ্রহ প্রবল হলো। মন্ত্রীরা মৃগয়ায় যাবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে রাজা ও রানীকে নিয়ে লাবাণকে গেলেন। সেখানে প্রতিদিন তিনি দিনের বেলায়

মৃগয়ায় যেতেন নিকটবর্তী বনের মধ্যে সৈন্যদল সঙ্গে নিয়ে। আর বাগানবাড়ির সুবাসিত সন্ধ্যাগুলো তিনি বাসবদত্তার সঙ্গে নিরালায় কাটাতেন। এইরকম একদিন রাজা যখনি শিকারে বেরিয়ে গেলেন, মন্ত্রী যৌগন্ধনারায়ণ আর রানী বাসবদত্তাও ছদ্মবেশ ধরে তখনি বেরিয়ে পড়লেন পথে। অন্যান্য মন্ত্রীরা অন্তঃপুরে আগুন লাগিয়ে দিলেন। আর খুব কোলাহল কান্নাকাটি করতে লাগলেন—"মহারানী আর নেই! আগুনে পুড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে! তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধনারায়ণও প্রাণ হারিয়েছেন!" গ্রামের সকলেই সেইকথা বিশ্বাস করল। তারাও এসে রানী আর মন্ত্রীর জন্য কান্নাকাটি করতে লাগল।

এদিকে বৎসরাজ উদয়নের বড় আদরের রানী বাসবদত্তা এক সামান্য রমণীর ছদ্মবেশে হাঁটতে হাঁটতে, ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে পৌঁছলেন মগধে। রাজার সঙ্গে যে বিচ্ছেদ তাঁর হলো সেটা সাময়িক না চিরদিনের জন্যে—এই চিন্তাতেই তাঁর মন আপ্লুত ছিল, শরীরের কষ্ট তাঁর কষ্ট বলেই মনে হচ্ছিল না। মগধের রাজধানী রাজগৃহের একপ্রান্তে ছিল এক শান্ত তপোবন। সেখানে পরিব্রাজক পরিব্রাজিকার ছদ্মবেশে শ্রান্ত, অবসন্ন দেহে উপস্থিত হলেন তাঁরা।

সেই তপোবনটিতে বাস করতেন মগধরাজ দর্শকের মাতা, সামান্য আশ্রমবাসিনীর মতোই। সেদিন রাজকন্যা পদ্মাবতী এসেছিলেন তপোবনে, তাঁর মাকে দেখতে। সঙ্গে তাঁর পরিচর্যার জন্য অনেক সৈন্য সামন্ত আর সখীদের দল। তারা রাজকন্যার সুখ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখছে। কিন্তু রাজা দর্শকের সেই অপরূপ সুন্দরী বোনটির কোনো খেয়ালই নেই সেদিকে। ভারী সরল, ভারী নিষ্পাপ ঐ রাজকন্যা পদ্মাবতী। তিনি এক আশ্রমবালিকার মতোই মিশে গেছেন আশ্রমবাসীদের সঙ্গে। তাঁর দাসদাসীদের, প্রহরীদের সরিয়ে দিয়ে তিনি সকলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন কল্পতরুর মতো। তিনি জানতে চাইলেন, কার কি প্রয়োজন আছে, কি তাঁদের প্রার্থনা

তাঁর কাছে। তাঁদের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। আশ্রমে যাঁরা থাকেন তাঁদের প্রয়োজন তো সামান্যই, তাঁরা অল্পেই সন্তুষ্ট। রাজকন্যার কাছে চাইবার কিছুই ছিল না তাঁদের। কিন্তু এগিয়ে গেলেন অন্য একজন—রাজা উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধনারায়ণ। রাজকন্যা পদ্মাবতীর কাছেই তাঁর বিশেষ প্রয়োজন। তিনি রাজকন্যার সামনে গিয়ে বললেন, "আমি প্রার্থী। আমার ভগিনী আছেন সঙ্গে। এঁর স্বামী এখন প্রবাসে। কিছুদিনের জন্য আপনি এর ভার নিন!"

পদ্মাবতী রাজী হলেন সঙ্গে সঙ্গে। যৌগন্ধনারায়ণও নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

আশ্রমবাসীগণ, রাজকন্যা, রাজকর্মচারীরা আর পরিব্রাজক-পরিব্রাজিকার বেশে যৌগন্ধনারায়ণ ও বাসবদত্তা নানারকম আলাপ-আলোচনা করছেন। এই সময় হঠাৎ এক ব্রহ্মচারী তপোবনে ঢুকে তাঁদের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি খুব ক্লান্ত আর উত্তেজিত। আশ্রমে প্রবেশ করে তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক ওদিকে তাকাচ্ছিলেন। রাজকন্যার এক সখী তাঁকে ডেকে আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করলেন। জলপান করে ও হাত-মুখ ধুয়ে একটু সুস্থ হলেন তিনি। তারপর বললেন—"আমি লাবাণক থেকে আসছি, লাবণক গ্রাম বৎসরাজ্যের সীমানায়। সেখানে বৎসরাজ উদয়ন তাঁর মহিষী বাসবদত্তাকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য এসেছিলেন শিকার করবার জন্য। একদিন রাজা বনে মৃগয়ায় গেছেন, এই সময় অন্তঃপুরে এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে রানী বাসবদত্তা পুড়ে মারা যান। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মন্ত্রী যৌগন্ধনারায়ণেরও মৃত্যু হয়েছে। এদিকে রাজা উদয়ন বন থেকে ফিরে সব শুনে শোকে পাগলের মতো হয়ে গেছেন। আহা! রানীকে বড় ভালবাসেন তিনি। সর্বক্ষণ তাঁরই নাম উচ্চারণ করছেন। রাজা আগুনে ঝাঁপ দিতেও গিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রী ও অমাত্যরা তাঁকে বাধা দেয়। তারপর অনেক সান্ত্বনা দিয়ে

অনেক কষ্টে ভুলিয়ে তাঁরা রাজাকে নিয়ে লাবাণক থেকে চলে গেছেন। তাঁরা চলে যাবার পর ঐ বিষণ্ণ লাবাণক গ্রামে থাকতে আমারও আর ভাল লাগল না, তাই বেরিয়ে পড়লাম।"

রাজা উদয়ন এত কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরই জন্য, একথা শুনে বাসবদত্তার দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। পদ্মাবতী তো জানেন না ইনি উদয়নের মহিষী। তিনি ভারী অবাক হয়ে সখীদের বললেন—"ছাখো! এঁর মনটি কি নরম, পরের দুঃখে কিরকম কষ্ট পাচ্ছেন!" যৌগন্ধনারায়ণ তাড়াতাড়ি বললেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমার ভগিনী পরের দুঃখ একেবারেই সইতে পারেন না।"

সন্ধ্যা নেমে আসছিল। বিশ্রাম নিয়ে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হবার পর ব্রহ্মচারী চলে গেলেন। তাঁর একটু পরে পরিব্রাজকবেশী যৌগন্ধ-নারায়ণও সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা করলেন।

পদ্মাবতী তখন বাসবদত্তাকে সঙ্গে করে তপোবনের একটি কুটিরে আশ্রয় নিলেন সেই রাত্রির মতো।

বাসবদত্তা পদ্মাবতীর কাছে নিজের নাম বলেছিলেন আবন্তিকা। রাজধানীতে এসে রাজকন্যার যত্নে ও আদরে কদিন সুখেই কাটল আবন্তিকার। কিন্তু তারপর এমন কয়েকটি ঘটনা দ্রুত ঘটে গেল তাঁর জীবনে যা তিনি আগে কখনও কল্পনাই করতে পারেন নি।

একদিন রাজউদ্যানে অনেকক্ষণ খেলাধূলার পর তাঁরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরছেন। পদ্মাবতীর মুখটি পরিশ্রমে রক্তিম হয়ে উঠে তাঁকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাসবদত্তা তখন ঠাট্টা করে তাঁকে বললেন—"আমি যেন তোমার বরের মুখ তোমার পাশেই দেখতে পাচ্ছি। তোমার বিবাহের আর দেরী নেই।" পদ্মাবতী লজ্জিত হলেন। বাসবদত্তা ও সখিগণ তাঁকে হাস্য পরিহাসে ব্যস্ত করে তুললেন। হঠাৎই এক সখীর মুখে বাসবদত্তা শুনলেন বৎসরাজ উদয়নকেই রাজকন্যা পদ্মাবতী স্বামীরূপে পেতে চান। বৎসরাজের রূপ ও গুণ সম্পর্কে সখীরা আলোচনা শুরু করলে বাসবদত্তা তাঁর অজ্ঞাতবাসের কথা ভুলে

গিয়ে হঠাৎ বলে ফেললেন, "বৎসরাজ উদয়ন খুবই সুন্দর দেখতে। আর তিনি বহু গুণের অধিকারী।" সকলেই অবাক হয়ে তাঁকে যখন জিজ্ঞেস করল যে তিনি এতকথা জানলেন কি করে, তখন তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বুদ্ধিমতী বাসবদত্তা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "উজ্জয়িনীবাসীরা সকলেই একথা বলে থাকেন, তাই বলছি।"

এইসব কথাবার্তার মাঝখানে পদ্মাবতীর ধাত্রী এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি সবাইকে ডেকে বললেন, "রাজকন্যা পদ্মাবতী বৎসরাজ উদয়নের কাছে বাগদত্তা হয়েছেন।" এই আকস্মিক সংবাদে বাসবদত্তা বিহ্বল হয়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে জানতে চাইলেন, রাজা উদয়ন নিজেই পদ্মাবতীকে বিবাহ করতে চেয়েছেন কিনা? উত্তরে ধাত্রী জানালেন, বৎসরাজ অন্য কোনো দরকারে মগধে এসেছিলেন, তখন মহারাজ দর্শক তাঁকে সর্বাংশে তাঁর ভগিনীর উপযুক্ত দেখে পদ্মাবতীকে তাঁর হাতে তুলে দেবেন স্থির করেছেন। এতে বাসবদত্তা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এই ভেবে যে উদয়নের এতে কোনো অপরাধ নেই। আবার দাসী ও সখী পরিজনদের আসন্ন বিবাহ উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে তাঁর মন বিষাদে ভরে উঠল।

বিবাহের দিনে অন্তঃপুরে যখন পদ্মাবতীর সখীরা তাঁকে নিয়ে আনন্দ-উৎসবে মত্ত তখন বাসবদত্তা একা বাগানে বেরিয়ে এলেন। গিয়ে বসলেন এক গাছের তলায়। আজকের এই হাসি-আনন্দের দিনে তাঁর মনে নেই কোনো আনন্দ, কান্নায় ভেসে যাচ্ছে তাঁর দু'নয়ন। যখনই তাঁর মনে পড়ছে তিনি হারাতে চলেছেন তাঁর স্বামীকে, তখনই তাঁর চোখের জল আর বাধা মানছে না, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে তাঁর দৃষ্টি।

দুঃখে সান্ত্বনা পাবার আশায় তিনি নিভৃতে গিয়ে উদ্যানের এক গাছের নিচে বসেছিলেন। সেখানেও এক দাসী গিয়ে উপস্থিত হলো তাঁর কাছে। রাজপুত্রীর জন্য বিবাহের মালা তাঁকেই গেঁথে দিতে হবে।

উচ্চবংশে তাঁর জন্ম, তিনি সচ্চরিত্রা আর মালাও গাঁথতে পারেন সুন্দর, তাই রানীর অনুরোধে মালা গাঁথার ভার পড়েছে তাঁর ওপর। নিয়তির এই নিষ্ঠুর পরিহাসে অতি দুঃখেও বাসবদত্তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। তিনি নীরবে একটি অপরূপ মালা প্রস্তুত করে দাসীর হাতে তুলে দিলেন। সে জানতেও পারলে না, মালা যিনি গাঁথলেন তাঁর মনের মধ্যে তখন কী আলোড়ন চলেছে।

খুব ধুমধাম করে উদয়নের সঙ্গে পদ্মাবতীর বিবাহ হয়ে গেল। রাজা দর্শক তাঁর বোনের বিয়েতে কোনো ত্রুটিই রাখলেন না।

রাজা উদয়ন পদ্মাবতীকে বিয়ে করলেন, রাজকন্যাকে তাঁর পছন্দও হলো, কিন্তু বাসবদত্তাকে তিনি ভুলতে পারলেন না কিছুতেই। বয়স্যর সঙ্গে গল্প করার সময় মাঝে মাঝেই বাসবদত্তার প্রসঙ্গ এসে পড়ত। অনেক সময় তিনি ভুলেই যেতেন যে বাসবদত্তার মৃত্যু হয়েছে।

বিবাহের কিছুদিন পরে একদিন রাজকন্যা পদ্মাবতী বাসবদত্তা ও সখীদের নিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় রাজা উদয়নও তাঁর বিদূষককে নিয়ে সেখানে গেলেন। বাসবদত্তা ও পদ্মাবতী তাড়াতাড়ি গিয়ে মাধবীলতার কুঞ্জের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। রাজা উদয়ন ও তাঁর বয়স্য বসন্তক মনে করলেন, উদ্যানে শুধু তাঁরা দুজনেই রয়েছেন। তাঁরা মন খুলে গল্পগুজব করতে লাগলেন। কথায় কথায় বসন্তক বললেন, "মহারাজ, মহিষী বাসবদত্তা তো আর জীবিত নেই, আর দ্বিতীয়া মহিষী পদ্মাবতীও এখানে অনুপস্থিত। একটা কথা সত্যি করে বলুন তো। এদের দুজনের মধ্যে কে আপনার বেশি প্রিয়?" রাজা একথা সেকথা বলে প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু বসন্তকও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি বারবার সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। অবশেষে রাজাকে স্বীকার করতেই হলো, বাসবদত্তাকে তিনি ভুলতে পারেননি একেবারেই। রাজকন্যা পদ্মাবতীর সুন্দর রূপ, মধুর ব্যবহারে রাজা মুগ্ধ হয়েছেন, তাঁকে ভালবেসেছেন, তাঁর প্রতি স্নেহশীল হয়েছেন। কিন্তু বাসবদত্তার

জন্য তাঁর মনে যে আসনটি পাতা সেখানে আর কারোকে তিনি বসাতে পারেননি। বাসবদত্তার বিরহে রাজা এখনও কাতর।

আড়াল থেকে সব শুনলেন দুই মহিষী। রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষে জল এল বাসবদত্তার। এই অজ্ঞাতবাস, এই বিরহও যেন মধুর বোধ হলো। ওদিকে পদ্মাবতীর সখীরা ক্ষুব্ধ হলো রাজার কথায়, তাঁকে নিষ্ঠুর বলে গাল দিল। পদ্মাবতী কিন্তু মানলেন না সে কথা। তাঁর সরল মন উদয়নের উপর সহানুভূতিতে ভরে উঠল, তিনি বলে উঠলেন—"ওকথা বলো না সখী, রাজা কত দয়ালু ছ্যাখো, কত কোমল তাঁর মন, এখনও তিনি তাঁর প্রিয় মহিষীকে ভুলতে পারেন নি।"

বাসবদত্তা মুগ্ধ হলেন তাঁর এই উদারতার পরিচয় পেয়ে। পদ্মাবতীকে বললেন, "সখী, বড় সুন্দর তোমার মনটি। তুমি সুখী হও এই কামনা করি।"

রাজা উদয়ন তখনও বসন্তকের সঙ্গে পুরনো দিনের কথা আলোচনা করছেন। সেইসব দিনের কথা স্মরণ করে বাসবদত্তাকে হারানোর দুঃখ তাঁর মনে আবার নতুন করে বাজল। ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল তাঁর দুই চোখ দিয়ে। তাঁর বিদূষক ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, "মহারাজ, যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর কি হবে? আপনি অশ্রুসংবরণ করুন। আমি মুখ ধোবার জল নিয়ে আসি, আপনি মুখ ধুয়ে ফেলুন।" এই বলে তিনি রাজাকে রেখে জল আনতে গেলেন।

এই সময় পদ্মাবতী মাধবীকুঞ্জের আড়াল থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন উদয়নের সামনে। স্বামী কষ্ট পাচ্ছেন দেখে তাঁর মনও ব্যথিত হয়ে উঠেছিল। একটু পরে পদ্মপাতায় জল নিয়ে ফিরলেন বসন্তক। তাঁর হাতের দিকে তাকিয়ে পদ্মাবতী বললেন, "এটা কি হবে?" বসন্তক বিব্রত হয়ে উঠলেন। সত্যকথা বললে রাজার নূতন মহিষী দুঃখ পাবেন। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "কাশফুলের রেণু লেগে

মহারাজের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তাই মুখ ধোবার জন্য পদ্মপাতায় জল এনেছি।”

এর কয়েকদিন বাদে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল যাতে বাসবদত্তা যে বেঁচে আছেন এমন একটা বিশ্বাস রাজার মনে দেখা দিল। রাজকন্যা পদ্মাবতী মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন শুনে বসন্তককে সঙ্গে নিয়ে রাজা উদয়ন গেলেন তাঁকে দেখতে। কিন্তু যেখানে রাজকন্যার থাকার কথা ছিল সেই সমুদ্রগৃহে গিয়ে উদয়ন দেখেন, পদ্মাবতী সেখানে নেই। শুধু তাঁর জন্য পাতা রয়েছে কোমল নিভাঁজ শয্যাটি। রাজা পদ্মাবতীর অপেক্ষায় সেখানে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর দুই চোখে নেমে এল ঘুম। তিনি সেই শয্যার ওপরেই শুয়ে পড়লেন। বিদূষক ক্ষীণ একটি দীপশিখা ঘরের কোণে জ্বালিয়ে রেখে রাজার গায়ে দেবার জন্য একটি চাদর খুঁজে আনতে গেলেন।

এই সময় আবন্তিকাবেশী বাসবদত্তা দাসীর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। তিনিও পদ্মাবতীর মাথা-ব্যথার খবর পেয়ে ছুটে এসেছেন। সমুদ্রগৃহে ঢুকে মৃদু দীপের আলোয় তিনি দেখলেন শয্যায় কে যেন শুয়ে রয়েছে। তাঁকে পদ্মাবতী ভেবে তিনি গিয়ে বসলেন তাঁর পাশে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার জন্য। তখনই স্বপ্ন দেখতে দেখতে রাজা তাঁরই নামটি উচ্চারণ করলেন। বাসবদত্তা চমকে উঠে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন, রাজা উদয়ন শুয়ে রয়েছেন শয্যায়! উদয়ন ঘুমের মধ্যেই কয়েকটি প্রশ্ন করলেন তাঁকে। বাসবদত্তাও অজান্তে উত্তর দিয়ে ফেললেন। তারপরে তাঁর হুঁশ ফিরে এল, যদি তিনি রাজার কাছে ধরা পড়ে যান! তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে উদয়নের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি ভাবলেন, সত্যিই কি বাসবদত্তাকে দেখলেন! না স্বপ্ন।

বসন্তক ফিরে এলে উদয়ন তাঁকে বললেন, “সখা, আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, এইমাত্র আমি বাসবদত্তাকে দেখলাম, তিনি জীবিত আছেন,”—বিদূষক তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। ভাবলেন, রাজার

বিভ্রম ঘটেছে। তিনি সান্ত্বনা দিয়ে রাজাকে বললেন, "মহারাজ, মহিষী বাসবদত্তার কথা চিন্তা করে আপনি অত উতলা হবেন না, মনকে শক্ত করুন, শান্ত করুন, আসন্ন যুদ্ধযাত্রার কথা চিন্তা করুন। এখন বিচলিত হবেন না। রাজা চুপ করলেন কিন্তু তাঁর মন বারবার বলতে লাগল, "আমি বাসবদত্তাকেই দেখেছি, বাসবদত্তাকেই দেখেছি!"

বেশিক্ষণ আর এ নিয়ে ভাববার অবসর পেলেন না তিনি। মহারাজ দর্শকের দূত এল তাঁর কাছে। মহারাজ সংবাদ পাঠিয়েছেন —রাজা উদয়নের মন্ত্রী তাঁর সৈন্য সামন্ত নিয়ে সমাগত, মগধরাজও তাঁর বিশাল সেনাবাহিনী এবং হস্তী অশ্ব ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত। উদয়নের পরম শত্রু আরুণির বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে হবে। আর কালক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। রাজা উদয়ন সঙ্গে সঙ্গে সকল চিন্তা, সকল শোক, সকল আলস্য ভুলে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "চল, আমি এখনই যুদ্ধযাত্রা করতে প্রস্তুত।"

দুজন শক্তিশালী রাজার মিলিত সৈন্যদলের সামনে আরুণি দাঁড়াতে পারলেন না। বৎসরাজ উদয়ন ফিরে পেলেন তাঁর রাজ্যের অধিকৃত অঞ্চলগুলি। নিজের দেশে ফেরার সময় হলো এবার। তাঁর মন্ত্রী এবং অমাত্যগণ যে উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তা সার্থক হলো। এবার রাজার কাছে তাঁদের সব গোপন ষড়যন্ত্র প্রকাশ করা প্রয়োজন।

বৎসরাজ্যের রাজধানী কৌশাম্বীতে ফিরেছেন রাজা কিন্তু রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে তিনি শোকে আবার অধীর হয়ে উঠলেন। প্রতি কক্ষে প্রতিটি বাতায়নে দাঁড়ালেই বাসবদত্তার স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠছে। তাঁর শোক দ্বিগুণ হয়ে উঠল যখন তিনি খুঁজে পেলেন তাঁর ঘোষবতী বীণা, যে বীণা বাজাতেন মহিষী বাসবদত্তা। তাঁদের দুজনের বহু আনন্দের দিনের সাক্ষী সেই বীণাকে পেয়ে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্চ্ছা ভাঙার পরও তিনি বারবার বাসবদত্তার কথাই বলতে লাগলেন।

রাজা যখন এই রকম বিলাপ করছেন, সেই সময় প্রতিহারী এসে

দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। খবর দিলেন উজ্জয়িনীর রাজা প্রদ্যোত-মহাসেনের কাছ থেকে এসেছেন এক দূত আর সেখানকার মহিষী অঙ্গারবতীর কাছ থেকে এসেছেন বাসবদত্তার ধাত্রী বসুন্ধরা। এঁদের আগমনের কথা শুনে একটু ভয় পেয়ে গেলেন রাজা উদয়ন। একদিন তিনি বাসবদত্তাকে নিয়ে কৌশাম্বীতে পালিয়ে এসেছিলেন উজ্জয়িনী থেকে। তাঁকে বিবাহ করেছিলেন এবং সুখীও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে তো রক্ষা করতে পারেন নি। আজ যদি মহাসেনের দূত ও ধাত্রী তাঁকে বাসবদত্তার কথা জিজ্ঞেস করেন তবে কী উত্তর তিনি দেবেন?

মহারাজ উদয়ন প্রতিহারীকে আদেশ দিলেন পদ্মাবতীকে ডেকে আনবার জন্য। পদ্মাবতী কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর পাশের আসনে বসলে তিনি দূত এবং ধাত্রীকে প্রবেশের আদেশ দিলেন। তাঁরা ভিতরে এলে রাজা তাঁদের যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন এবং উজ্জয়িনীর সকলের কুশল প্রশ্ন করলেন। এরপর বাসবদত্তার প্রসঙ্গ উঠতেই রাজা শোকে কাতর হয়ে পড়লেন ও বিলাপ করতে লাগলেন। ধাত্রী তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "প্রভু, আপনি অত অধীর হবেন না, মৃত্যুর কথা তো কেউ বলতে পারে না, আর মৃত্যুর সময় কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারে না। আপনি ও রাজকন্যা যখন চলে এসেছিলেন তখন দুজনের চিত্র একটি ফলকে এঁকে আমরা আপনাদের বিবাহ দিয়েছিলাম। সেই চিত্র ফলকটি মহিষী আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আপনি সেটি দেখে শান্ত হোন।"

পদ্মাবতী সেইকথা শুনে ফলকে অঙ্কিত বাসবদত্তার ছবি দেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ধাত্রী ফলকের আবরণ সরিয়ে দিলেন। বাসবদত্তার ছবি দেখে পদ্মাবতী চমকে উঠে বললেন, "একি, এ ছবি যে একেবারে সখী আবন্তিকার মতো।" তিনি রাজাকে বললেন, "এক ব্রাহ্মণ আমার কাছে তাঁর ভগিনীকে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন আমার বিবাহের আগে। বলেছিলেন তাঁর ভগিনীর স্বামী প্রবাসে আছেন

আর তিনি পরপুরুষ দর্শন করেন না। তাঁর নাম বলেছিলেন আবন্তিকা। এই আবন্তিকার সঙ্গে বাসবদত্তার প্রতিকৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। আমি আবন্তিকাকে এখনই নিয়ে আসছি। এই বলে পদ্মাবতী অন্তঃপুরে গেলেন।

প্রতিহারী আবার প্রবেশ করল এই সময়। সে জানাল যে এক ব্রাহ্মণ রাজার দর্শনপ্রার্থী। তিনি মহিষীর কাছে গচ্ছিত তার বোনকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। রাজা সেই ব্রাহ্মণকে সসম্মানে নিয়ে আসবার আদেশ দিলেন।

ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাবতীও আবন্তিকাবেশী বাসবদত্তাকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখেই ধাত্রী বলে উঠলেন—"এ যে রাজকন্যা বাসবদত্তা।" কিন্তু পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ বাধা দিয়ে বললেন,—"না, না, ইনিই আমার ভগিনী!"

মহারাজ আবন্তিকার অবগুণ্ঠন খুলে ফেলার আদেশ দিলেন। তাহলে সব সংশয় দূর হবে। অবগুণ্ঠন তুলে দেবার পর রাজা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন আবন্তিকাই বাসবদত্তা। পরিব্রাজকবেশী যৌগন্ধনারায়ণ এই সময় বলে উঠলেন—মহারাজের জয় হোক! তারপর তিনি রাজার চরণে প্রণত হয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে ছলনা করে দেবীকে আপনার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি অপরাধী, আমাকে মার্জনা করুন।"

রাজা তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে ধরে বললেন, "আমি যখন ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম তখন নানা কৌশলে আপনিই আমাকে রক্ষা করেছেন—আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু বাসবদত্তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে পদ্মাবতীর হাতে গচ্ছিত রেখেছিলেন কেন?"

উত্তরে যৌগন্ধনারায়ণ বললেন, পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হবে, দৈবজ্ঞগণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বলে তিনি পদ্মাবতীর অন্তঃপুরেই বাসবদত্তাকে রাখার ব্যবস্থা করেন। আরও বললেন, মহারাজ দর্শকের ভগিনীর সঙ্গে বিবাহ না হলে উদয়নের পক্ষে

আরুণিকে পরাজিত করা সম্ভব হত না। সেজন্যই তাঁকে এতসব ছলনার আশ্রয় নিতে হয়।

পদ্মাবতী নিজের অজ্ঞান্তে বাসবদত্তার সঙ্গে সামান্য এক সখীর মতো আচরণ করেছিলেন বলে ক্ষমা চাইলেন। বাসবদত্তা তাড়াতাড়ি তাঁকে বুকে তুলে অনেক আদর করলেন।

এতদিন অদর্শনের পর বাসবদত্তাকে ফিরে পেয়ে রাজা উদয়নের মনে আজ বড় আনন্দ। তিনি বাসবদত্তাকে বললেন, "চল, দূত এবং ধাত্রী বসুন্ধরার সঙ্গে পদ্মাবতীকে নিয়ে আমরাও উজ্জয়িনীতে যাই। সেখানে গিয়ে আমরা মহারাজ এবং মহিষীর চরণে প্রণাম জানাব।"

সকলে আনন্দের সঙ্গে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

মেঘদূত

জ্যোতিভূষণ চাকী

কৈলাস পর্বতের কোলে অলকাপুরী। সেখানে এক যক্ষ বাস করত। কর্তব্য কাজে অবহেলা করায় তার প্রভু যজ্ঞপতি কুবের তাকে নির্বাসন দিলেন সুদূর রামগিরি আশ্রমে। সেখানে তাকে পূর্ণ এক বছর কাটাতে হবে। তার স্ত্রী রইবে একা—অলকাপুরীতে।

তীব্র বেদনা বুকে বয়ে আট মাস কাটাল সে। আষাঢ়ের প্রথম দিনটিতে তার চোখে পড়ল পর্বতসানুলগ্ন নবীন এক মেঘখণ্ড। সে ভাবল মেঘ তো আকাশপথের পথিক, সর্বত্র তার গতি। ঐ মেঘটুকুকেই তো দূত হিসেবে পাঠানো যেতে পারে তাঁর বিরহিণী পত্নীর উদ্দেশে।

যক্ষ কুটিফুলে অর্ঘ্য রচনা করে প্রীতিপূর্ণ বচনে মেঘকে স্বাগত জানাল। কিন্তু মেঘ তো জড় পদার্থ—ধূম, জ্যোতিঃ, জল আর পবনের সমষ্টিমাত্র। যা চেতন মানুষের কাজ তা অচেতন মেঘ করবে কেমন করে? কিন্তু যক্ষের যা মনের অবস্থা তাতে চেতন-অচেতনের পার্থক্যবোধ তার কাছে আশা করা যায় না। মেঘকেই সে যোগ্য দূত বলে ঠিক করল। কিন্তু মেঘের মন জয় করতে হবে তাকে। নম্র কণ্ঠে মেঘকে সম্বোধন করে সে বলল—ওগো মেঘ, আমি জানি তুমি ভুবনবিদিত পুষ্কর ও আবর্তক মেঘের বংশে জাত। তুমি ইন্দ্রের প্রধান সহচর, তুমি ইচ্ছা-মূর্তি। আমার প্রিয়া আজ দূরবর্তিনী। তাই দৈববশে আমি তোমার কাছে প্রার্থী। ধনপতি কুবেরের ক্রোধে



আমি প্রিয়ার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। আমার সংবাদ তুমি তাঁর কাছে বয়ে নিয়ে যাও। আমি জানি, আমার দুঃখ তুমি বুঝবে। যারা তাপিত তারা তো তোমারই শরণ নেয়।

এইভাবে মেঘকে তুষ্ট করে যক্ষ তাকে দিল অলকার পথনির্দেশ। পথ চলার কষ্ট মেঘ বুঝতে পারবে না, পথের অমিত সৌন্দর্য তার মনকে আকৃষ্ট করে রাখবে। অবাধগতিতে গেলে মেঘ নিশ্চয় যক্ষ-প্রিয়াকে দেখতে পাবে, মিলনের আশায় সে এখনও দিন গুনছে। বৃন্ত যেমন করে ফুলকে ধরে রাখে আশাও তেমনি বিরহীহৃদয়কে ধরে রাখে। কিন্তু আর দেরি নয়। যক্ষ বলল, এবারে তোমার প্রিয়বন্ধু রামচন্দ্রের পদচিহ্ন অঙ্কিত পর্বতটিকে আলিঙ্গন করে তুমি রওনা হও। ক্লান্তি বোধ করলেই শিখরে শিখরে বিশ্রাম করে যেও। তোমাকে দেখে মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনারা ভাববে ঝঞ্ঝাবেগে কোনো পাহাড়চূড়া উড়ে যাচ্ছে বুঝি। দিঙ্‌নাগেরা হয়তো তোমার পথ রোধ করবে, তাদের তুমি এড়িয়ে যেও। তুমি যখন উত্তর দিকে যাত্রা করবে তখন তোমার দেহে লগ্ন হবে ইন্দ্রাণু। মোহনচূড়ায় সজ্জিত কৃষ্ণের মতো দেখাবে তোমাকে। জনপদবধূরা সরল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যেন তোমাকে পান করবে। হলকর্ষিত উচ্চ ভূমিতে উঠলে তোমার ভাল লাগবে। মাটির ঘ্রাণ নিতে নিতে তুমি একটু বেঁকে পশ্চিমে যেও, তারপর আবার উত্তরমুখী হয়ো। পশ্চিমে যেতে পড়বে আম্রকূট পর্বত। আম্রকূট তোমাকে সানন্দে মাথায় নেবে। সেখানে মৃদু বর্ষণের পর লঘুগতি হয়ে এগিয়ে যেও। সেখানে বিন্ধ্যপর্বতের গায়ে রেবানদী দেখতে পাবে। তুমি তার গজমদসুগন্ধ বারিধারা পান করে নিও। এরপর তোমার পথে পড়বে দশার্ন। এই দশার্নেরই রাজধানী বিদিশা। সেখানে বেত্রবতীর স্বাদু জল কিছুটা পান করে নিও। বিদিশার উপকণ্ঠে আছে আর একটি সুন্দর পাহাড়। তার নাম 'নীচৈঃ'। তোমার সংস্পর্শে এলে সেখানে কদম্ব পুলকিত হয়ে উঠবে। উত্তরেই তোমাকে যেতে হবে, কিন্তু একটু বাঁকা পথ হলেও

উজ্জয়িনী তোমাকে দেখে যেতেই হবে। সেখানকার পুরনারীদের অপাঙ্গ দৃষ্টি যদি না দেখ তাহলে সত্যিই বঞ্চিত হবে। পথে পড়বে নির্বিন্ধ্যা নদী, হংসশ্রেণীকে মনে হবে তার মেখলা। দেখবে সিন্ধু নদ শুকিয়ে হয়েছে একটি বেণীর মতো। তুমি জলধারায় তাকে সঞ্জীবিত করো। তারপর অবন্তী হয়ে যেও উজ্জয়িনীতে যে নগরী স্বর্গ থেকে খসে পড়া একটি পত্রের মতো। সেখানে গন্ধবতী নদীর তীরে মহেশ্বরের মন্দিরে যেতে ভুলো না। সেখানে একটু আগে পৌঁছলে সন্ধ্যাবাতি পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তোমার গম্ভীর ধ্বনি সেখানে আরতি বাদ্যের কাজ করবে। দেবসেবার ফললাভ করবে তুমি। রাতে কোনো প্রাসাদশীর্ষে কাটিয়ে সূর্যোদয় হলেই আবার পথ চলতে শুরু করো। গম্ভীরা নদীজলে একটু জলবর্ষণ করে দেবগিরিতে যাবে। সেখানে স্বয়ং কার্তিকেয় অধিষ্ঠিত। তাঁর ময়ূরটিকে নাচিয়ে যেতে ভুলো না। তুমি একটু গম্ভীর গর্জন করলেই তা গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হয়ে দ্বিগুণিত হবে—সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরটি নেচে উঠবে। এরপর চর্মন্বতী নদী পার হয়ে যাবে কলহরনগরে। সেখানে নগরবধূরা যখন সুন্দর চোখ তুলে তোমার দিকে চাইবে তখন মনে হবে এ যেন কৃষ্ণভ্রমরের এক পঙ্‌ক্তি। ব্রহ্মাবর্তদেশে ছায়া বিস্তার করে সরস্বতী নদী পার হয়ে ধরবে নসখলের পথ, তারপর ক্রমশ উত্তরে যেতে যেতে হবে কৈলাস পর্বতের অতিথি। সেখানে তুষারে ঢাকা শৃঙ্গ দেখে মনে হবে তা যেন মহাদেবের প্রতিদিনের অট্টহাসিরই জমাট-বাঁধা রূপ।

ঐ কৈলাসেরই কোলে অলকা।

পথের বর্ণনার পর এবারে যক্ষ অলকার বর্ণনা দিল। সৌন্দর্য সম্পদ আর সুখ যে অলকায় পুঞ্জীভূত, এককথায় যা সব পেয়েছির দেশ।

তার নিজের বাড়ির নির্দেশ এবং তার পত্নীর বর্ণনা দিতে গিয়ে যক্ষ বলল—কুবেরের গৃহের উত্তরেই ইন্দ্রধনুর সুন্দর তোরণে সজ্জিত আমার গৃহ। কছেই একটি স্বল্পদীর্ঘ মন্দার তরু—আমার স্ত্রী সেই

তরুটিকে পালিতপুত্রের মতোই স্নেহে বর্ধিত করেছেন। আমার গৃহে একটি দীঘি আছে। মরকতশিলায় তার সোপান নির্মিত। এই দীঘিতে বাস করে হংসদল। বর্ষায় তোমাকে দেখে ক্লান্তি দূর হয় বলে তারা আর মানস সরোবরে সাদৃশ্য এই দীঘির ধারেই একটি ক্রীড়াশৈল, কোমল ইন্দ্রনীলমণিতে যার শিখর নির্মিত! এই ক্রীড়াশৈলে কুরবক গাছের বেড়ায় ঘেরা একটি মাধবী কুঞ্জ আছে। কুঞ্জের কাছেই দুটি তরু—একটি রক্তাশোক, অন্যটি বকুল। এইসব লক্ষণ দেখে আর আমার গৃহদ্বারের দু-পাশে আঁকা একটি শঙ্খ ও পদ্ম দেখে তুমি আমার গৃহ চিনে নিতে পারবে। সেখানে তুমি যাঁকে দেখবে, যুবতী বিষয়ে তিনিই বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁকেই জানবে আমার দ্বিতীয় জীবনস্বরূপ। তুষারপীড়িত কমলিনীর মতোই তিনি হয়তো এখন বিশীর্ণা। করতলে ন্যস্ত প্রিয়ার সেই মুখ দেখে তোমার মনে হবে তুমি ঢেকে রাখলে চাঁদের যে দশা হয় সেই দশাই তাঁর হয়েছে। হয়তো তুমি দেখবে তিনি আমার কল্যাণে পূজাপার্বণ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। কিংবা আমার বিরহমলিন রূপ কল্পনা করে তারই ছবি আঁকছেন। হয়তো বা পিঞ্জরে বদ্ধ সারিকাকে প্রশ্ন করছে—ওগো, রসিকা! তাঁর কথা কি তোর মনে পড়ছে? হয়তো তিনি কোলের উপর বীণা রেখে গান করছেন, সে গান তো আমাকে নিয়েই। গাইতে গিয়ে বীণার তার তাঁর চোখের জলে স্নাত হচ্ছে। হয়তো দেখবে তিনি বেদীর উপর একটি একটি করে রাখা ফুলগুলো গুণে দেখছেন—বিরহশেষ হতে আর কত মাস বাকি। রাতে সৌধবাতায়ন থেকে দেখবে জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। না সুপ্ত না জাগ্রত এই অবস্থায় তাঁকে দেখে তোমার মনে হবে তিনি যেন মেঘাচ্ছন্ন দিনের ম্লান কমলিনীর শোভা ধারণ করেছেন। তুমি দেখবে বিচ্ছেদবেদনায় তিনি সমস্ত প্রসাধন ত্যাগ করেছেন। তাকে দেখলে তুমি সমবেদনায় অশ্রু বর্ষণ করবে। যদি দেখ তিনি নিদ্রাচ্ছন্ন রয়েছেন তবে গর্জন না করে প্রহরকাল অপেক্ষা করো। প্রভাতে

তোমার জলকণার স্পর্শে তিনি জেগে উঠবেন। তুমি বাতায়নে এসে বসলে স্থিরদৃষ্টিতে তিনি তোমাকে দেখবেন। তখন তুমি মধুর গম্ভীর ধ্বনিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলবে। তুমি তাঁকে সম্বোধন করে বলবে—হে পতিবত্নী ! আমি তোমার পতির বন্ধু মেঘ। আমি তাঁরই সংবাদ হৃদয়ে বহন করে এনেছি। পবন পুত্র হনুমান রামের সংবাদ নিয়ে অশোকবনে সীতার কাছে গেলে তিনি যেমন সাগ্রহে তার দিকে চেয়েছিলেন, আমার প্রিয়াও তেমনি সাগ্রহে তোমাকে দেখবে, তোমার কথা শুনবে। হে আয়ুষ্মান, তুমি তাকে বলো—রামগিরি আশ্রমবাসী তোমার প্রিয়তম সুস্থ আছেন। তোমার কুশল প্রশ্ন করে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। তোমার মতো তাঁর দেহও ক্ষীণ, তোমার মতোই তিনি উষ্ণশ্বাসে দগ্ধ। তাঁর উৎকণ্ঠা-ভরা হৃদয়ের কথা তিনি আমার মুখে বলে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন—হে চণ্ডী ! প্রিয়ঙ্গুলতায় তোমার দেহশোভা, হরিণীর চকিত নয়নে তোমার দৃষ্টিপাত, চন্দ্রে তোমার মুখশ্রী, ময়ূরের কলাপগুচ্ছে তোরার কেশপাশ এবং ক্ষীণকায় নদীর ক্ষুদ্রতরঙ্গে তোমার ভ্রূভঙ্গি আংশিক দেখতে পাই। কিন্তু হায়, কোন একটি বস্তুতে তোমার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য খুঁজে পাই না। আমি পাথরের উপরে গিরিমাটি দিয়ে তোমার মূর্তি আঁকি কিন্তু চোখের জলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ হয়ে যায়। রাত্রি আমার কাছে সুদীর্ঘ মনে হয়, দিনের তাপও কিছুতেই কাটে না, তোমার বিরহবেদনায় আমি একান্ত অসহায় হয়ে পড়েছি। মানুষের জীবনে সুখদুঃখ আবর্তিত হয় একথা মনে করে আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছি, তুমিও একেবারে ভেঙে পড়ো না। নারায়ণ যেদিন শেষনাগ ত্যাগ করে উঠবেন সে দিনই আমার শাপের অবসান হবে। কোনো রকমে আর চারটি মাস কাটিয়ে দাও। ওগো মেঘ এইভাবে তোমার সখীকে আশ্বস্ত করে তুমি কৈলাস শিখর থেকে শিলং কিছু দিয়ে এস। আসার সময় তাঁর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে এস আর তাঁর কুশল সংবাদ দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিও।

যক্ষ মেঘের কাছে এই আবেদন জানাল। মেঘ 'তোমার দূত হতে আমি সম্মত' এমন কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু যক্ষ ভাবল নীরবতাই মেঘের ভাষা, কারণ চাতক যখন মেঘের কাছে জল প্রার্থনা করে তখন নীরবেই মেঘ জলদান করে থাকে। ঈপ্সিত কাজ সম্পন্ন করেই তো মহতেরা উত্তর দিয়ে থাকেন।

কুমারসম্ভব

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গিরিরাজ হিমালয়ের মেয়ের নাম পার্বতী। তাঁকে নিয়েই এই কাহিনী। কিন্তু সেই কাহিনী বলার আগে হিমালয় সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া যাক। আমাদের দেশের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতের অবস্থান। পুব থেকে পশ্চিমে ঐ পর্বত ছড়িয়ে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশে পৃথিবীর সীমারেখা যেন বেঁধে দিয়েছেন।

সেই হিমালয়ের রূপ বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। অসংখ্য মণি-মাণিক্য আর রং বেরংয়ের শিলাখণ্ড ওঁর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। কত পশুপাখি সেখানে, কত গাছপালা, কত গুহা, কত সরোবর। মেঘের দল ওখানে সারাদিন খেলা করে বেড়ায়। দিনের বেলা যখন সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ে তখন ওখানকার মণিমাণিক্য আর পাথরের গা থেকে নানা রকম আভা বেরুতে শুরু করে। তখন ভারী মজা হয়। সুন্দরী অপ্সরারা মনে করে, এই যাহ্, সন্ধে হয়ে এল নাকি! এখনো তো সাজ গোঁজ করা, চুল বাঁধা কিছুই হয়ে ওঠেনি। অমনি ওরা হুটোপাটি করে সাজতে বসে যায়, চুল বাঁধতে বসে যায়। আর সেই হুড়োহুড়িতে কি কাণ্ডই না ঘটে। আবার রাত্রিবেলা যখন প্রচণ্ড তুষার পড়তে শুরু করে তখন হিমশীতল তুষারের নিচে চাপা পড়ে যায় ঐ সব মণিমাণিক্য। যেন হিমালয়ের বুকে কলঙ্ক এঁকে দেয় বরফরাশি। কিন্তু সে সময় ফুটফুটে চাঁদের আলো বরফের

উপর ছড়িয়ে পড়লে হিমালয়ের সব কলঙ্ক মুছে যায়। চাঁদের আলোয় তখন অপরূপ শোভা ফুটে ওঠে চারপাশে।

তাছাড়া ওখানে মেঘেরা ভারী দুষ্টুমি করে খেলা করে। হিমালয়ের বুকে, কোমরে মেঘের দল যখন ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের ছায়া নেমে আসে পায়ের কাছে। শ্রান্তক্লান্ত মুনিঋষিরা বিশ্রাম করার জন্য যখন সেই ছায়ায় এসে একটু গা এলিয়ে বসেন, অমনি ঝুরঝুর করে বৃষ্টি নামিয়ে দেয় মেঘ। বেচারী মুনিঋষিরা তখন বিরক্ত হয়ে উঠে পড়তে বাধ্য হন।

হিমালয় হচ্ছে একটা পবিত্র স্থান। সেখানে যাগযজ্ঞ তপস্যা ইত্যাদি করার জন্য সব রকম উপকরণই ছড়িয়ে আছে। সেখানে মুনিঋষিরা যেমন তপস্যা করেন তেমনি আবার গুহার মধ্যে নিষ্ঠুর ব্যাধেরাও বাস করে। তারা নিরীহ পশুপাখি শিকার করে জীবন-ধারণ করে।

জ্যোৎস্না রাতে হিমালয়ের উপর হরিণীর দল তাদের সাদা ধবধবে লেজ দুলিয়ে ছুটোছুটি করে। মনে হয় যেন চামর দুলিয়ে হিমালয়কে বাতাস করা হচ্ছে। আর তাই দেখে হিমালয়ের রাজা নাম যে সার্থক তা বলা যায়। কেননা, আগেকার দিনে রাজাদের মাথায় থাকত ছাতা, চামর দুলিয়ে তাদের বাতাস করা হত। গিরিরাজ হিমালয়ের বেলাতেও ঠিক ওরকমটিই হয়।

যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, এই হিমালয়ের বন্ধু ছিলেন মেরু পর্বত। কুলমর্যাদায় দুজনেই সমান সমান। হিমালয় তাই মেরু পর্বতের মেয়ে মেনকাকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলেন। রূপে গুণে মেনকার তুলনা নেই। গিরিরাজের তিনি যোগ্য স্ত্রী। অবশেষে এই মেনকার গর্ভে হিমালয়ের একটি পুত্র সন্তান জন্মালো। তার নাম রাখা হলো মৈনাক।

ওদিকে সমুদ্রের নাগকন্যারা এখবর জানতে পেরে খুব খুশি। ওঁরা মৈনাককে পতিত্বে বরণ করে নিলেন। তারপর মৈনাককে নিয়ে



ওঁরা সমুদ্রে চলে গেলেন। গিরিরাজও খুশি হলেন। তিনি আগেই সমুদ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চেয়েছিলেন। বিবাহসূত্রে ওঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

এরপর মেনকার গর্ভে জন্ম নিলেন পার্বতী। পার্বতীর কিছু পূর্ব পরিচয় জানা দরকার। তোমরা দক্ষ রাজার নাম শুনেছ। পার্বতী তাঁর আগের জন্মে এই দক্ষ রাজার মেয়ে ছিলেন। তখন অবশ্য ওঁর নাম ছিল সতী। স্বয়ং শিব ছিলেন ওঁর স্বামী। শিব যার স্বামী তাঁর তো দুঃখে থাকার কথা নয়, কিন্তু কি হলো জান, দক্ষ রাজা একদিন শিবের খুব নিন্দা করেছিলেন। সতী দক্ষ রাজার মুখে শিবের সেই নিন্দা শুনে সহ্য করতে পারেন নি। ক্ষোভে দুঃখে তিনি তাঁর জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রাণ ত্যাগ করলেই তো সব অতৃপ্তি মিটে যায় না, সতী আবার জন্ম নেবার জন্য মেনকার গর্ভে এলেন। পার্বতীর যেদিন জন্ম হলো সেদিন আকাশ বাতাস খুশিতে ঝলমল করে উঠল, দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করলেন, শঙ্খ বাজালেন, আনন্দময় হয়ে উঠল পৃথিবী।

সেই পার্বতীর জগৎ আলো করা রূপ। পর্বতের মেয়ে বলে হিমালয়ই ওঁর নাম রেখেছেন পার্বতী। পরে অবশ্য এই পার্বতীর নাম হয়ে গিয়েছিল উমা। সে এক মজার ঘটনা। পূর্বজন্মের স্বামী শিবকে আবার ফিরে পাবার আশাতেই পার্বতী মেনকার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন সে কথা তোমাদের আগেই বলেছি, কিন্তু শিবকে পেতে হলে তো তপস্যা করতে হবে। তাই পার্বতী যখন কঠোর তপস্যা করতে যাবেন বলে ঠিক করলেন তখন ওঁর মা মেনকা খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মেনকা ওঁকে বার বার বারণ করতে লাগলেন, উ মা, মা গো—তপস্যায় যেয়ো না। অত কঠিন তপস্যা তুমি সইতে পারবে না। উ মা, উ মা—আর তাই থেকেই ওর নাম হয়ে গেল উমা।

যাই হোক, হিমালয় কিন্তু মৈনাকের চেয়ে পার্বতীকেই বেশি ভালবাসতেন। মেয়ের দিকে তিনি অপলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন

আর মুগ্ধ হতেন। পার্বতী আর দশটা মেয়ের মতোই পুতুল খেলত, মন্দাকিনী নদীর তীরে বালিতে বসে ঘর বানাত, ঘুঁটি খেলত। ঐভাবে বাপ-মায়ের আদরের মেয়ে পার্বতী ধীরে ধীরে শৈশব থেকে যৌবনে পা দিল।

যৌবন যেন উথলে উঠল পার্বতীর সারা দেহে। অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠল পার্বতী। সৃষ্টিকর্তা ওকে এমন নিখুঁত করে গড়ে তুললেন যেন সৃষ্টিকর্তার হাতে যত জারিজুরি ছিল সব কিছু ওকে নিখুঁত করে গড়ে তুলতেই ফুরিয়ে গেল। এমন অপূর্ব লাবণ্য ওর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল যা বর্ণনাতেই আসে না। ওর পদ্মের পাঁপড়ির মতো চোখ। সে চোখে ও যখন তাকাত তখন মনে হত, হরিণীরা বোধ হয় ওরই কাছ থেকে ঐ দৃষ্টি ধার নিয়ে চঞ্চলা হতে শিখেছে। পার্বতী যখন গলায় মুক্তোর মালা পরত, তখন মনে হত, ঐ মালাই বুঝি পার্বতীর গলায় থাকতে পেরে আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। পার্বতীর কণ্ঠস্বর কত মধুর। সেই স্বরের কাছে কোকিলের ডাকও বেসুরো বীণার মতো মনে হত। পার্বতীর পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে চুলের ঢল, সেই চুলের শোভা দেখে চমরী হরিণীরাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ত। ওরা লজ্জা পেত, কেননা ঐ চুলের কাছে ওদের লেজের শোভা যে কিছুই না। এক কথায় পার্বতী এই জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হয়ে উঠল।

একদিন হিমালয়ের বাড়িতে দেবর্ষি নারদ বেড়াতে এলেন। এসে এ মেয়েকে দেখে তিনিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তারপর তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন, এ মেয়ে খুব ভাগ্যবতী। শিবের একমাত্র পত্নী হবেন এই মেয়ে।

হিমালয় এই ভবিষ্যৎবাণী শুনে খুব খুশি হলেন। মেয়ে সুখে থাক কে না চায়। ঠিক করলেন, শিব ছাড়া আর কারো কাছে উনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না। ফলে মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেলেও উনি পাত্র খোঁজার কোন চেষ্টাই আর করলেন না। আবার শিবের কাছে

যে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাবেন এমন সাহসও হয় না, কি জানি বাবা, শিব যদি রাজি না হন। তা ছাড়া শিব নিজে যদি প্রস্তাব না পাঠান তাহলেই বা কি করে এ বিয়ে সম্ভব।

ওদিকে শিব তখন হিমালয় পর্বতের এক নির্জন জায়গায় গঙ্গার তীরে তপস্যার জন্য বাস করতেন। তপস্যা ছাড়া আর কিছুতেই তাঁর মন নেই। ওঁর পত্নী সতী দেহত্যাগ করার পর আর উনি বিয়েও করেন নি।

শিবের আশ্রমের চারপাশে দেবদারু বনে মনের সুখে হরিণেরা ছুটোছুটি করে খেলা করত। মৃগনাভির গন্ধে আকাশ বাতাস মাতাল হয়ে থাকত। কিন্নর দল সব সময় গান গেয়ে চারপাশ মুখর করে রাখতেন। তা ছাড়া সেখানে শিবের অনেক অনুচরও থাকতেন। শিব সারাক্ষণ নিজের তপস্যাতেই মগ্ন হয়ে থাকতেন।

শিব হিমালয়েই তপস্যা করছেন জানতে পেরে গিরিরাজ ঠিক করলেন শিবকে যত্ন আত্তি করার জন্য উনি পার্বতীকে শিবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। তুজন সখিকে সঙ্গে দিয়ে তিনি পার্বতীকে শিবের কাছে পাঠিয়েও দিলেন।

ওদিকে স্বর্গরাজ্যে তখন খুব অনাসৃষ্টি চলছিল। তোমরা তারকাসুরের নাম শুনেছ, সেই তারকাসুর নানাভাবে অত্যাচার করে দেবতাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। দেবতারা নিরুপায় হয়ে ব্রহ্মার কাছে অভিযোগ জানাতে এলেন। ওদের নেতা হলেন ইন্দ্র।

ব্রহ্মার কাছে এসে ওঁরা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে বন্দনা করলেন। ব্রহ্মা তাতে খুব খুশি হলেন। তারপর দেবতাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? কি হয়েছে তোমাদের? অমন শুকনো শুকনো মুখ কেন গো, খুব তুশ্চিন্তায় পড়েছ বলে মনে হচ্ছে?

বৃহস্পতি হাত জোর করে বললেন, ভগবান, আপনি তো সমস্ত জগতের মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছেন, অথচ আপনি আমাদের বিপদের ক থা

জানেন না, তাও হয়! আপনি তো সবই জানেন, আপনি তারকাসুরকে বর দিয়েছিলেন, সেই বর পেয়ে তারকাসুর এমন উদ্ধত হয়ে উঠেছে যে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এক একবার সে ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হয় আর আমাদের উপর নানা উপদ্রব করে চলে যায়। স্বর্গলোক এখন বিভীষিকার রাজ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম সুদর্শন চক্র দিয়ে ওকে দমাতে পারব কিন্তু চক্র ছোঁড়ার পর সেটিতেও কোনো কাজ হচ্ছে না। মণিহারের মতো সেই চক্র ওর গলায় গিয়ে শোভা পেতে থাকে। এ অবস্থায় ঐ অসুরকে দমন করতে পারি এমন একজন সেনাপতি আমাদের দিন, এই আমাদের প্রার্থনা।

ব্রহ্মা মন দিয়ে সব কথা শুনলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে তাই হবে। অপেক্ষা কর। তবে ঐ সেনাপতিকে আমি নিজের হাতে সৃষ্টি করব না, কেননা তারকাসুরকে তো আমিই বর দিয়েছি আবার ধ্বংস করার ব্যবস্থা আমিই করতে পারি না। তবে তোমাদের বলে রাখছি, শিবের যে ছেলে হবে, সেই ছেলেই তারকাসুরকে বধ করবে। তোমরা শিবের মনকে উমার দিকে টেনে আনতে চেষ্টা কর। শিবের সঙ্গে উমার বিয়ে দিতে পারলেই তোমাদের কার্য সিদ্ধি হবে।

দেবতারা এই প্রস্তাব শুনে ফিরে এসে ইন্দ্রের রাজসভায় সলা-পরামর্শ করতে বসে গেলেন। তারপর ঠিক হলো, মদনদেবের উপর দায়িত্ব দেওয়া হোক।

ইন্দ্র মদনদেবকে বললেন, ভাই মদন তুমিই পার। উমার দিকে শিবের আকর্ষণ বাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র তোমারই আছে। এ কাজ তো আর গায়ের জোর দেখিয়ে হবে না, তুমি এমন কিছু কৌশল নাও, যাতে শিব আর উমার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। আর ওঁদের বিয়ে হলে ঐ বংশে যে সন্তান জন্মাবে, সে-ই তারকাসুরকে বধ

করে আমাদের বাঁচাতে পারবে।

মদনদেব মন দিয়ে সব শুনলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে। বসন্তকে যদি সঙ্গে পাই, তা হলে শিবের কঠিন মনও গলিয়ে দিতে পারব।

ইন্দ্র বললেন, আমাদের কিছুটা কাজ এগিয়েই আছে। অপ্সরাদের মুখে শুনেছি উমা নাকি এখন শিবের আশ্রমেই রয়েছেন। সেখানে তিনি শিবের সেবা যত্ন করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তা ছাড়া ভাই মদন, বসন্ত তো সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। যেখানে আগুন সেখানেই যেমন বাতাস, তেমনি তুমি যেখানে, বসন্তও তো সেখানেই থাকে। এবার তুমি যদি দায়িত্ব নিয়ে আমাদের বাঁচাও।

মদনদেব রাজি হয়ে দায়িত্ব নিলেন। তিনি তার স্ত্রী রতি আর বন্ধু বসন্তকে নিয়ে শিবের আশ্রমে এসে হাজির হলেন। আর তাই দেখে আকাশে বাতাসে ভারী সুন্দর একটা মজার ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। অকাল বসন্ত শুরু হয়ে গেল আশ্রমের চারপাশে। দখিনা বাতাস বইতে শুরু করল, সূর্যের গতিপথ গেল পালটে। সূর্যদেব ক্রমশ উত্তর দিকে সরে যেতে শুরু করলেন। গাছে গাছে ফুল ফুটতে শুরু করল, আম গাছে মুকুল ধরতে শুরু করল। তাতে ভ্রমর এসে মধু পান করে গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করল। বনে বনে রক্ত পলাশের আবির্ভাব দেখা গেল। হরিণের চোখ আরো চঞ্চল হয়ে উঠল। ওরা শুকনো ঝরা পাতার উপর দিয়ে মনের আনন্দে ছুটোপাটি ছুটোছুটি শুরু করে দিল। শীতের কনকনে বাতাস ফুরিয়ে গিয়ে পরিপূর্ণ বসন্ত এসে চারপাশ মাতাল করে দিল।

আর এর ফলে তপোবনে যাঁরা তপস্যা করতে এসেছিলেন তাঁরা বেশ অসুবিধায় পড়ে গেলেন। তাঁরা কিছুতেই বিচলিত হবেন না ঠিক করে মন শক্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সবাই তো আর কঠোর তপস্যা করার মন নিয়ে সেখানে আসেন নি, নিরীহ পশুপাখি, জীবজন্তুর কি দোষ! ওরা বসন্তের ছোঁয়া পেয়ে নিজের

নিজের প্রিয়জনদের সঙ্গে খুশির খেলায় মেতে উঠতে লাগল। অপ্সরারা প্রেমের গান গাইতে শুরু করে দিলেন। ওদিকে শিবের কানেও সে গান গিয়ে পৌঁছল। তিনি প্রকৃতির চঞ্চলতা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু তবু তিনি তপস্যাতেই মগ্ন থাকার চেষ্টা করলেন।

শিবের পর্ণকুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নন্দী। তিনি অবস্থা বুঝে সবাইকে ধমকে চঞ্চল হতে বারণ করলেন। ফলে গাছপাতার কাঁপন থেমে গেল। ভ্রমরের পাখার চঞ্চলতা থেমে গেল। পাখিরা প্রাণ খুলে গান গাইছিল, তারাও নীরব হলো। পশুরাও শান্ত হয়ে খুব সাবধানে চলাফেরা শুরু করে দিল। সে এক অদ্ভুত অবস্থা।

ওদিকে মদনদেবও নাছোড়বান্দা। তিনি বসন্তকে সঙ্গে করে শিব যেখানে তপস্যায় বসেছেন সেখানে এলেন। ওঁর একটাই উদ্দেশ্য—শিবকে চঞ্চল করে তোলা। এসে দেখলেন, হরিণের চামড়া পরে শিব নিশ্চলভাবে আসন করে ধ্যানে বসেছেন। দৃঢ় ভঙ্গি, হাতের চেটো দুটো কোলের উপর পেতে উর্ধ্বমুখী করে রেখেছেন, দেখে মনে হয় যেন পদ্মফুল ফুটে আছে। মাথায় জটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। চোখদুটো আধবোজা কিন্তু নিশ্চল। শিবের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল না, তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয়েছেন। তাঁর চারপাশে যেন জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে।

শিবের ঐ রকম শান্ত সৌম্য মূর্তি দেখে মদনদেবের হাত থেকে তীর ধনুক খসে পড়ল। কিন্তু শিব তখন এমনই বিভোর যে তিনি তা বুঝতেই পারলেন না।

এমন সময় হঠাৎ দুই সখিসহ পার্বতীকে দেখা গেল। পার্বতীর উচ্ছল যৌবন দেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন মদনদেব। এত রূপ! সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। একবার যদি শিবের নজরে পড়ে যায় পার্বতী তাহলেই কার্যসিদ্ধি হবে। মদনদেব কেবল সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

ওদিকে পার্বতীও ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন ধ্যানরত শিবের

পর্ণকুটিরের দরজায়। আর তখনই শিব বুঝতে পারলেন কিছু একটা ঘটেছে। তিনি আসন থেকে ধীরে ধীরে নিজের দেহটাকে শিথিল করে দিলেন। ধীরে ধীরে আবার তিনি নিজের দেহের ভার ফিরে পেতে লাগলেন। এ জগতের মধ্যে তিনি আবার পুরোপুরি ফিরে এলেন।

শিবের ধ্যানভঙ্গ হয়েছে দেখে নন্দী শিবের কাছে এগিয়ে এসে বললেন, হিমালয়ের মেয়ে পার্বতী এসেছে, ও আপনাকে সেবা করতে চায়। শ্রীমতী দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

শিব চোখ ইশারায় জানালেন, আসতে বল।

পার্বতীকে নিয়ে নন্দী তক্ষুনি শিবের কাছে এগিয়ে এলেন। ঘরে ঢুকেই শিবকে প্রণাম করলেন পার্বতী। আর সে সময় তার খোঁপায় গোঁজা ফুল গড়িয়ে পড়ল শিবের পায়ের কাছে।

শিব তাতে সন্তুষ্ট হয়ে পার্বতীকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, তুমি এমন পতি লাভ কর, যিনি একমাত্র তোমাকে নিয়েই জীবন কাটাবেন। অন্য স্ত্রীতে তাঁর কোনো রকম আকর্ষণ থাকবে না।

ওদিকে মদনদেবও তখন এই রকম সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তাঁর সম্মোহন বাণ শিবের দিকেই তাক করে ধরে রেখেছেন। ধনুক থেকে তীরটা কেবল ছেড়ে দিতে যেটুকু সময়।

পার্বতী এরপর শিবের গলায় মালা পরিয়ে দেবার জন্য আরো এগিয়ে এলেন।

এসময় মহাদেবের বুকের ভেতর কেমন চঞ্চলতা প্রকাশ পেল। তিনি কিছুটা অস্থির হয়ে তাঁর তিন চোখ একত্র করে উমার দিকে তাকালেন। এই চোখের দৃষ্টি তো স্বাভাবিক নয়, পার্বতী সেই দৃষ্টির সামনে সঙ্কোচে লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিলেন।

কিন্তু শিব মুহূর্তের মধ্যেই যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। নিজেকে সংযত করে নিলেন। তারপর চারপাশে একবার তাকালেন। তাকিয়েই দেখেন, তীরধনুক হাতে করে মদনদেব তাঁকেই লক্ষ্য

করে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাস, সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। অমনি শিবের তৃতীয় নয়ন থেকে আগুনের শিখা বেরিয়ে এল। সেই আগুনে তক্ষুনি মদনদেব পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলেন।

শিব এরপর আবার তপস্যায় মগ্ন হবার জন্য তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বেচারী পার্বতী আর কি করে, ব্যর্থ হয়ে লজ্জায় আবার ফিরে এলেন বাপের কাছে। হিমালয় তাঁকে আবার তাঁর আশ্রয়েই টেনে নিলেন।

ওদিকে মদনদেবের স্ত্রী রতির তখন করুণ অবস্থা। স্বামীর মৃত্যু সংবাদে তিনি শোকে জ্ঞান হারালেন। ধীরে ধীরে আবার যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, তখন তিনি পাগলের মতো ছটফট করে কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। তিনি এগিয়ে এসে দেখলেন, তাঁর স্বামীর মৃতদেহ পুড়ে ছাই হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। সেই দৃশ্য দেখে তিনি সেই মাটিতেই আছড়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ শুরু করে দিলেন। কত পুরনো স্মৃতি ওঁর মনে পড়ে যেতে লাগল। সে সব কথা উনি স্বামীকেই উদ্দেশ করে বলতে লাগলেন, ওগো, তুমি একা একা পরলোকে চলে গেলে, এখন আমি কাকে নিয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকব। আমাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে গেলে না কেন গো! আমি এখন আর কার জন্য সাজব, আমার জীবন যে বৃথা হয়ে গেল। তোমার প্রাণের বন্ধু বসন্ত কোথায়? তাঁকে দেখছি না কেন? তাঁকেও কি মহেশ্বর ভস্ম করে দিয়েছেন?

রতির হাহাকার শুনে বসন্তদেব রতিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু বসন্তকে দেখে রতির কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেল। রতি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, ওগো বসন্ত, ভগবান কেবল ওঁকেই ভস্ম করলেন কেন! আমাকেও কেন একই সঙ্গে ভস্ম করে দিলেন না। আমি এখন একা একা বেঁচে থেকে

কি করব, আমিও আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেব। তুমি আমার চিতা সাজিয়ে দাও বসন্ত। আমাকে দাহ করে তুমি আমাদের দুজনের উদ্দেশে অঞ্জলি ভরে জল দিও। আমরা দুজনে পরলোকে বসে একসঙ্গে সেই শান্তিজল পান করব।

রতি চিতায় উঠবার জন্য মাথা খুঁড়তে লাগলেন, আর ঠিক এই সময় একটা ভবিষ্যৎবাণী হলো : হে নারী তোমার স্বামীকে আবার তুমি ফিরে পাবে। মদন আজ ভস্ম হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ওঁর উদ্ধার পাওয়ার পথও আছে। যে দিন পার্বতীর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাঁকে বিবাহ করবেন, সেই দিন মিলনের আনন্দে শিবই আবার তাঁকে বাঁচিয়ে দেবেন। সুতরাং হে সুন্দরী, তুমি এখনই দেহত্যাগ করো না। স্বামীর জন্য অপেক্ষা কর। তোমার স্বামীকে আবার তুমি ফিরে পাবেই।

রতি তাই শুনে কিছুটা শান্ত হলেন। তারপর স্বামীর পথ চেয়ে তিনি অপেক্ষায় সময় কাটাতে লাগলেন।

পার্বতী হিমালয়ের কাছে ফিরে এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু ওঁর দুঃখের আর শেষ নেই। ওঁরই জন্য বেচারা মদনের দেহ ভস্মিভূত হলো, এ দুঃখ ও কোথায় লুকোয়। অনেক ভেবে চিন্তে পার্বতী ঠিক করলেন, নিজের রূপ যৌবন দেখিয়ে তো শিবকে পাওয়া গেল না, এবার তপস্যা করে দেখতে হবে।

মেনকা তাই শুনে পার্বতীকে বারণ করতে লাগলেন, এ যে কঠিন তপস্যা মা, তোমার ফুলের মতো শরীর যে তা সইতে পারবে না। তুমি যেও না।

কিন্তু জল যেমন নিচের দিকে বয়ে যাবেই, তেমনি পার্বতীও তখন তপস্যা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। বাবার কাছে অনুমতি চাইলেন পার্বতী। হিমালয় সবই জানতেন, তিনি বাধা দিলেন না, বরং উৎসাহই দিলেন।

পার্বতী এবার মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য চলে এলেন এক নির্জন

গিরি শিখরে। সেখানে শীতগ্রীষ্ম উপেক্ষা করে তিনি তপস্যায় ব্রতী হলেন। কখনো বা অনাহারেই কাটতে লাগলো, কখনো আবার অর্ধাহারে। যিনি ফুলের আঘাতই সইতে পারেন না, তিনি তখন খোলা আকাশের নিচে মাটিতে পাথরে শয্যা নিতে লাগলেন। আগুনের কুণ্ডলী জ্বেলে তার সামনে বসে তিনি তপস্যা করতেন। কখনো বা তিনি প্রখর সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, কখনো আবার প্রচণ্ড ঠাণ্ডার ভিতর জলের উপর বসে কিংবা কখনো তুষারপাতকে উপেক্ষা করেই ওঁর তপস্যা চলতে লাগল।

এইভাবে তপস্যা করতে করতে পার্বতী যখন বিভোর, তখন একদিন জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী সেই বনে এসে প্রবেশ করলেন। সন্ন্যাসীর পরণে হরিণের চামড়া, হাতে একখানা পলাশের লাঠি, সারা শরীর দিয়ে যেন তাঁর ব্রহ্মতেজ ফুটে বেরুচ্ছিল।

অতিথি এসেছেন দেখে পার্বতী তাঁর সেবা যত্ন শুরু করে দিলেন। সন্ন্যাসী সেই সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকে যখন শোক পায়, আঘাত পায়, দুঃখ কষ্ট পায় তখনই তপস্যা করতে এগিয়ে আসে, কিন্তু তোমাকে দেখে তো সে রকম মনে হচ্ছে না। তুমি কেন তপস্যা করতে এসেছ? তুমি যদি স্বর্গ পাবে বলে মনে করে থাক তা হলে ভুল করেছ। স্বর্গ পাবার জন্য তোমার এই তপস্যার প্রয়োজন ছিল না। তোমার বাপ-মায়ের কাছেই তো তোমার স্বর্গ রয়েছে। আর যদি ভাল স্বামী পাবে বলে তপস্যা করে থাক, তারও তো প্রয়োজন ছিল না, তোমার যা রূপলাবণ্য তাতে এমনিতেই তোমার মনোমত পতি পাওয়ার কথা। মণি-মাণিক্য কাউকে খুঁজে বেড়ায় না। মণি-মাণিক্যকেই লোকে খুঁজে বেড়ায়। তা হলে তপস্যা করতে এসেছ কেন?

পার্বতী নিজের মনের কথা বলতে গিয়ে কেমন সঙ্কোচে পড়লেন। তখন তিনি তাঁর সখীকে ইঙ্গিত করলেন সন্ন্যাসীকে সব কথা বুঝিয়ে বলার জন্য। সখী মদনভস্মের কথা বললেন। বললেন, উমা

যতক্ষণ না মহেশ্বরকে পতিরূপে পাচ্ছেন, ততক্ষণ তিনি এই তপস্যা চালিয়ে যাবেনই।

সন্ন্যাসী পার্বতীকে প্রশ্ন করলেন, এসব কি সত্যি ?

পার্বতী মাথা নাড়লেন, সত্যি।

সন্ন্যাসী বললেন, কিন্তু আমি মহেশ্বরকে চিনি। লোকটা একদম ভাল না। ওর জন্য তপস্যা করছ, এটা আমার ভাল লাগছে না। ও শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়ায়। তোমাকে ঐ সব ভয়ানক জায়গায় শ্বশুরঘর করতে হবে, এটা কে চায় বল দেখি। তা ছাড়া ওর বাহন হচ্ছে ষাঁড়। ও যদি তোমাকে বিয়ে করে, ঐ ষাঁড়ের পিঠে চাপিয়ে ও তোমাকে নিয়ে যাবে। আর সে দৃশ্য দেখে সবাই যে খুব হাসাহাসি করবে, তখন কি তোমার ভালো লাগবে। তাছাড়া আরো কথা আছে, মহেশ্বরের তো জন্মেরই ঠিক নেই। ওর আবার তিনটে চোখ। কি সব উদ্ভুট্রি ব্যাপার। তার চেয়ে বরং মনকে তুমি শান্ত কর। ওকে মন থেকে একেবারে তুমি মুছে ফেল।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে পার্বতী মনে মনে খুব চটে যাচ্ছিলেন। ওর ঠোঁট কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়। উনি বললেন, শিবের সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না, তাই ওসব বলছেন। উনি শ্মশানে-মশানে থাকেন ঠিকই, কিন্তু সমস্ত জগৎ সংসারের উনিই অধীশ্বর। ওঁর বেশভূষা যেমনই থাক না কেন, উনি যে কী তা অত সহজে বোঝা যায় না।

পার্বতী খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। সখীকে বললেন, সন্ন্যাসীকে মহেশ্বরের নিন্দা করতে বারণ করে দে, নইলে আমিই এখান থেকে চলে যাব। নিন্দা যে শোনে সেও তো পাপী।

পার্বতীর ঐ অবস্থা দেখে সন্ন্যাসী খুশি হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে ধরা দিলেন। দেখা গেল, শিব নিজেই সন্ন্যাসীর বেশ ধরে পার্বতীকে পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। তখন পার্বতী পরম আনন্দে তাঁর তপস্যার কষ্ট ভুলে গেলেন। উত্তেজনায় সমস্ত শরীর ওঁর থরথর করে কাঁপতে লাগল।

এরপর একদিন পার্বতী গোপনে তাঁর সখীকে শিবের কাছে পাঠালেন। সখী প্রস্তাব দিল, ওদের মধ্যে যাতে বিয়ে হয় তার ব্যবস্থা করতে।

শিব বললেন, বেশ তাই হবে। তারপর তিনি অনেক ভেবে চিন্তে সপ্তর্ষিকে স্মরণ করলেন। সপ্তর্ষি বলতে সাতজন ঋষি। এঁরা হলেন মারীচ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু আর বশিষ্ঠ। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু করার পর যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা এই ঋষিরা সম্পূর্ণ করেছিলেন। এঁরা শিবের কাছ থেকে ডাক পেয়েই দেখা করতে এলেন। সঙ্গে এলেন বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী।

শিব বললেন, দেখুন, আপনারা এসেছেন। আমি ঠিক আমার প্রয়োজনে আপনাদের ডাকি নি। আপনারা সবাই জানেন, স্বর্গের দেবতারা শত্রুনাশের জন্য আমার কাছে সন্তান প্রার্থনা করছেন। ওঁদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই আমি পার্বতীকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে চাই। ফলে, আপনারা যদি দয়া করে হিমালয়ের কাছে এই প্রস্তাবটা দেন।

ঋষিরা সানন্দে রাজি হলেন। তারপর তাঁরা হিমালয়ের কাছে ওষধিপ্রস্থ নগরে এসে হাজির হলেন। হিমালয় অতিথিদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বেতের আসনে বসতে দিলেন। তারপর মুনিদের প্রশস্তি গেয়ে বললেন, আপনারা আমার বাড়িতে আসায় আমি ধন্য। আমার এই জায়গাটা আপনাদের পায়ের ধুলো পেয়ে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো। আমি বা আমার স্ত্রী বা আমার মেয়ে আপনাদের কি কাজে লাগতে পারি বলুন ?

ঋষিরা বললেন, দেখুন আমরা আপনাদের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। স্বয়ং শিব হচ্ছে পাত্র। আপনি যদি আপনার মেয়েকে শিবের হাতে সম্প্রদান করতে রাজি থাকেন, তাহলে বলুন আমরা অগ্রসর হই।

হিমালয়ের এই প্রস্তাব শুনে আর আনন্দ ধরে না। তিনি তো

এরকমই চাইছিলেন। তিনি সম্মতি দিলেন।

ঋষিরা তখন বসে বিয়ের দিনও স্থির করে ফেললেন। ঠিক হলো, আর তিন দিন পরে জাঁকজমক করে শিব পার্বতীর বিয়ে হবে।

তিন দিন আর কতটুকু সময়। বিয়ের দিন এসে গেল। মহা ধুমধাম লেগে গেল বিয়ের বাড়িতে। শুরু হয়ে গেল গান বাজনা, হাসিঠাট্টা, শুরু হয়ে গেল কত রকম আচার অনুষ্ঠান। সখীরা কত যত্ন করে পার্বতীকে সাজাতে বসলেন।

ওদিকে বর আর বরযাত্রীরাও এসে হাজির। বর বলতে তো শিব। সারা গায়ে ছাই মাখা, কপালে যে চোখ সেটিকে মনে হচ্ছিল যেন চন্দনের তিলক, পরণে হাতীর চামড়া, মাথায় জটা, ষাঁড়ের পিঠে চেপে বিয়ে করতে এলেন তিনি।

বর আসার সঙ্গে সঙ্গেই সারা বাড়ি চঞ্চল হয়ে উঠল। সখীরা শাঁখ বাজাতে শুরু করলেন, চতুর্দিকে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। মেয়েরা বর দেখার জন্য ছুটোছুটি শুরু করে দিল। বিয়ে বাড়ির হৈচৈ চলল সারাদিন। তারই মাঝে যাগযজ্ঞ হলো, মালা বদল হলো, শিব আর পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল।

আর আপততঃ কুমারসম্ভব কাহিনীও এইখানেই ফুরোল।

দিলীপ রাজার পুত্রলাভ

গৌরী ধর্মপাল

সরযূ নদীর ধারে উত্তরকোমল নামে এক রাজ্য। সেই রাজ্যে রাজত্ব করতেন এক রাজা, তাঁর নাম দিলীপ। শুধু রাজা নয়, একটার পর একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে তিনি হয়েছিলেন রাজচক্রবর্তী, সম্রাট।

রাজা দিলীপের যেমন রূপ, তেমন গুণ, তেমন তেজ, তেমন বিদ্যে, তেমন বুদ্ধি আর তেমনি তাঁর রাজ্যশাসনের কায়দা। যেমন ঢালাও সুবিধে, তেমনি কড়া শাসন। প্রজারা ভয়ও করে, আবার ভালও বাসে, ঠিক যেন বাবার মতো।

রাজার অনেক রানী। তার মধ্যে সুয়োরানী হলেন মগধের রাজকুমারী সুদক্ষিণা। সুদক্ষিণা তো সুদক্ষিণাই। বড়ই ভদ্র, বড়ই স্নেহময়ী, বড়ই উদার। সবার মন বুঝে চলেন। কার কী পছন্দ, যুগিয়ে দেন। কার কী অভাব, মিটিয়ে দেন। ঠিক যেন মায়ের মতো।

দিলীপ আর সুদক্ষিণার রাজ্য-জোড়া সন্তান। কিন্তু তাঁদের নিজেদের কোন সন্তান নেই। এত সুখ-সমৃদ্ধি-আনন্দের মধ্যে সেই দুঃখটি দিনরাত মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে।

আশায় আশায় অনেকদিন কাটল। তারপর একদিন রাজা বললেন রানীকে—রানী, ছেলে কি মুখের কথা? ছেলে পাবার জন্য কত ব্রত নিয়ম জপ তপ করতে হয়, আমরা তো সে সব কিছুই করি নি। চল, গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে যাই। তিনি নিশ্চয় একটা উপায় বলে দেবেন।

রানী বললেন, তাই যাই চল।

রাজা-রানী গুরুর আশ্রমে যাবেন, রাজপুরীতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু রাজা বললেন, না, বেশি লোক যাবে না, হৈ হৈ হবে, আশ্রমের শান্তি নষ্ট হবে।—

ভালবাসে যারা গাছ-পথ্-পাখালি,
এ-ফাঁকে পাতাতে চায় বন-মিতালি,
সাদাসিধে খাওয়া-দাওয়া আর চুপচাপ—
তারা শুধু যাক্।

নির্দিষ্ট দিনে মন্ত্রীদের হাতে রাজ্য-ভার দিয়ে, শুচিশুদ্ধ হয়ে, ব্রহ্মা-ঠাকুরের পুজো দিয়ে রাজা-রানী রথে উঠলেন। কি তার স্নিগ্ধ গম্ভীর আওয়াজ, যেন গুরু গুরু ডাকছে বর্ষার মেঘ। তার ওপরে রূপসী রানী যেন বিদ্যুতের মতো ঝলমল করছেন, আর রাজা যেন মেঘ না হাতি? মেঘের হাতি প্রকাণ্ড সেই ঐরাবত।

রথ চলেছে—কখনো বুনো, কখনো মেঠো, কখনো গেঁয়ো পথ ধরে। রাজপ্রাসাদের সোনার খাঁচা ছেড়ে বাইরে খোলামেলায় এসে রাজারানীর কি ভালই যে লাগছে! পথের দুধারে কত যে গাছ ছেয়ে আছে কত রকম ফুলে। তাদের ডালপাতা কাঁপিয়ে, ফুলের রেণু ছড়িয়ে, শালের আঠার ভুরভুরে গন্ধ মেখে বাতাস বইছে মৃদুমৃদু। রথের শব্দকে মেঘধ্বনি মনে করে মুখ বাড়িয়ে ময়ূরেরা ডেকে উঠছে ক্যাঁ···ও···ক্যাঁ ··ও। হরিণেরা ছুটে এসে জোড়ায় জোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রথ দেখছে। রাজা বলছেন, সুদক্ষিণা, দেখ দেখ, ঠিক তোমার মতো চোখ। সুদক্ষিণা বলছেন, উঁহু, তোমার মতো। হঠাৎ পাখির ডাক—রাজারানী চমকে মুখ তুলে দেখেন, একদল সারস মালার মতো দুলতে দুলতে উড়ে যাচ্ছে। পুকুরে পুকুরে ফুটেছে পদ্মফুল, তার ঠাণ্ডা মৃদু সুবাস ভেসে আসছে হাওয়ায়। মাঝে-মধ্যে ব্রহ্মোত্তর গ্রাম। সেখানে থাকেন ব্রাহ্মণেরা, যাগ-যজ্ঞ করেন, পড়াশোনা করেন, করান। টাকার চিন্তা করতে হয় না, কর দিতে হয় না, নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে সুখে-



স্বচ্ছন্দে দিন কাটান রাজার কল্যাণে। রাজার রথ যাবে শুনে তাঁরা আসছেন প্রাণভরে তাঁদের প্রিয় রাজাকে আশীর্বাদ করতে। রাজা রথ থামিয়ে মাথা নিচু করে নিচ্ছেন তাঁদের আশীর্বাদ। গয়লাপাড়া থেকে মাতব্বররা আসছেন রাজা-রানীর জন্যে টাটকা ননী-মাখন নিয়ে। তাঁদের তারা শুধিয়ে নিচ্ছেন পথের ধারের নাম-না-জানা গাছ-গাছালির নামগুলো। পরণে সুন্দর উজ্জ্বল বেশ, চোখে-মুখে ছুটির খুশি—কি সুন্দর যে লাগছিল রাজা-রানীকে দেখতে। ঠিক যেন শীতের কুয়াশা-কাটা বসন্তের আকাশে ঝলমল করছে চাঁদ, আর তার পাশে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে চিত্রা তারাটি।

রানীকে কত কি দেখাতে দেখাতে চললেন রাজা। কোথা দিয়ে যে পথ ফুরিয়ে বিকেল হয়ে সুয্যি পাটে নামল, টেরও পেলেন না। সন্দে হব-হব, সেই সময় ঘোড়ারা হাঁপাতে হাঁপাতে রথ নিয়ে ঢুকল তপোবনের চৌহদ্দিতে। চারিদিক তাকিয়ে রাজারানীর চোখ জুড়িয়ে গেল। বন থেকে দলে দলে ফিরছেন তপস্বীরা কাঠ, কুশ, ফলমূল এইসব নিয়ে। পাতার কুঁড়েগুলির দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে গেছে হরিণেরা ঋষি পত্নীদের হাত থেকে উড়কি ধানের ভাগটি নিতে, ঠিক যেন টিফিন খেতে ভিড় করেছে বাচ্চার দল। মুনিদের মেয়েরা গাছে জল দিয়েই তক্ষুনি সরে যাচ্ছে, আর পাখিগুলো নির্ভয়ে এসে গাছের গোড়ার ছোট্ট গোলপুকুরে জমে থাকা সেই জল চুক চুক করে খাচ্ছে। যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হয়েছে, পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া, কি সুন্দর আহুতির গন্ধ ছড়িয়েছে চারদিকে।

রাজা রথ থেকে নামলেন, রানীকে হাত ধরে নামালেন, সারথিকে বললেন, ঘোড়াদের বিশ্রাম করাও। তারপর ঢুকলেন আশ্রমে। মুনিরা সাদরে স্বাগত জানালেন রাজা-রানীকে। তারপর এত সুন্দর করে আপ্যায়ন করলেন যে রথের ঝাঁকুনিতে তাঁদের যে ধকল হয়েছিল, সে সব যেন জুড়িয়ে গেল।

সন্দেবেলার পূজার্চনা যাগযজ্ঞ সেরে গুরু বশিষ্ঠ ঠাকুর বসে আছেন

অরুন্ধতীর সঙ্গে। সেইখানে রাজা-রানীকে নিয়ে গেলেন মুনিরা। কি তেজস্বী গম্ভীর শান্ত সমাহিত মূর্তি ঠাকুরের। অবশ্য রাজাও কম যান না। বশিষ্ঠ-ঠাকুরের আশ্রমই হলো রাজ্য। আর রাজার রাজ্যেই হলো তাঁর আশ্রম। মুনি ঋষির মতোই শান্ত সংযত হয়ে তিনি পালন, করেন সেই রাজ্য। বশিষ্ঠ তা বোঝেন বৈকি। তাই রাজারানী প্রণাম করতে স্নেহ-ক্ষরা চোখে তাঁদের অভিনন্দিত করে বললেন, রাজর্ষি, আপনার রাজ্য-আশ্রমটির কুশল তো?

তখন দিলীপ বললেন, ঠাকুর, আপনি যখন রয়েছেন আমার রাজ্যের ভার নিয়ে, তখন কি কুশল না হয়ে পারে? আপনার তপস্যা-বলে আমার প্রজারা সুখেই আছে। কেউ অকালে মরে না, রাজ্যে অনাবৃষ্টি নেই, অতিবৃষ্টি নেই, পঙ্গপাল নেই, বৃষ্টি হয় যথাসময়ে, শস্য হয় প্রচুর। শত্রুর আক্রমণও নেই। আপনি মন্ত্রবলেই তাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন, আমায় ধনুক ধরতেই হয় না। সবই ভাল কিন্তু ঠাকুর, আপনার এই বৌমার এখনো পর্যন্ত সন্তান হলো না। তাই এমন সোনার রাজ্যও আমার আর ভাল লাগে না। বড় দুশ্চিন্তা, বড় কষ্ট। কি করলে ছেলে পাব, বলে দিন ঠাকুর। এ জ্বালা আর সইতে পারছি না।

রাজার কথা শুনে ঋষির চোখ দুটি স্থির হয়ে গেল। ঋষি ধ্যানস্থ হলেন। তাঁকে দেখাতে লাগল যেন একটি শান্ত ঝিলের মতো, একটি মাছও নড়ছে না, সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ধ্যানের মধ্যে ঋষি দেখতে পেলেন অনেক বছর আগেকার একটি ঘটনা। দেখে ঋষি বললেন— রাজা,অনেক দিন আগে একবার স্বর্গে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তুমি পৃথিবীতে ফিরে আসছিলে, পথে কল্পতরুর ছায়ায় শুয়েছিলেন স্বর্গের গরু সুরভি। সুদক্ষিণার জন্যে তখন তোমার এমন মন কেমন করছিল, যে ফেরার তাড়ায় তুমি সুরভিকে প্রদক্ষিণ করলে না। তখন তিনি তোমায় শাপ দিলেন, 'তুমি যেমন আমায় অবজ্ঞা করলে, তেমনি আমার সন্তানকে সেবা না করলে তোমার সন্তান হবে না।'

রাজা, সে শাপ তুমিও শুনতে পেলে না, তোমার সারথি-ও না, কেননা দিগ্‌গজেরা তখন আকাশ গঙ্গায় নেমে ঝাঁপাই ঝুঁড়তে লেগেছে, যা শব্দ হচ্ছিল!

সেই থেকেই তোমার সাধের ঘরে কুলুপ পড়ে আছে রাজা। জান তো, মান্যজনকে মান না দিলে কল্যাণের পথে কাঁটা পড়ে। এখন সুরভিকে তো পাবে না; পাতালে বরুণ-রাজা এক বিরাট যজ্ঞ করছেন, তার যত ঘি-দুধ-দই-ছানা সব যোগাবার ভার সুরভির ওপর। তাই তিনি সেখানেই আছেন। সাপেরা ফটক পাহারা দিচ্ছে। ঢোকার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর মেয়ে নন্দিনী এখানে আমার আশ্রমেই আছে। তুমি আর সুদক্ষিণা শুচিশুদ্ধ হয়ে তার সেবা কর। সে হলো কামধেনু। সন্তুষ্ট হলে যা চাও তাই দেবে।

এই বলতে বলতেই বন থেকে চরে ফিরে এল অপূর্ব সুন্দর সেই হোমধেনু—নন্দিনী। কচিপাতার মতো লালগোলাপী চিকন গা, কপালের ওপর একটি সাদা লোমের বাঁকা রেখা—ঠিক যেন সাঁঝ-বেলাকার লালচে-রঙীন আকাশের কপালে ছোট্ট একটি সাদা বাঁকা চাঁদ উঠেছে। বাছুরটিকে দেখেই বৃষ্টির মতো মাটি ভিজিয়ে ভিজিয়ে ঝরে পড়তে লাগল তার কুসুম-কুসুম গরম দুধের ধার। তার খুরের ঘায়ে ওড়া ধুলো যখন রাজার গায়ে এসে পড়ল, তাঁর মনে হলো যেন তিনি তীর্থে চান করছেন।

পুণ্যদর্শনা নন্দিনীকে দেখে গুরু আবার বললেন, রাজা, নন্দিনী যখন নাম করতে করতেই এসে পড়েছে, তখন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নেই। সবসময় ওর কাছে-কাছে থেকে সেবা করে ওকে প্রসন্ন করার চেষ্টা কর। বনে যা জন্মায়, তাই খেয়ে থাকবে। নন্দিনী চললে চলবে, দাঁড়ালে দাঁড়াবে, বসলে বসবে, ও জল খেলে তবে তুমি জল খাবে। সকালবেলা চরতে যাবার সময় বৌমাও ভক্তিমতী হয়ে ওকে পুজো করে ওর সঙ্গে সঙ্গে যাবে এগিয়ে দিতে তপোবনের সীমানা পর্যন্ত। আবার সন্দেবেলা ফেরার সময়

আগে থেকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এইভাবে দুজনে মিলে ওর সেবা করতে থাক, যতদিন না ও প্রসন্ন হয়। কল্যাণ হোক তোমার, আপদ-বালাই দূরে যাক। আশীর্বাদ করি, তোমার বাবার মতো তুমিও সেরা পুত্ররত্ন লাভ কর।

দিলীপ আর সুদক্ষিণা সানন্দে গুরুর আদেশ মাথা পেতে নিলেন।

তপস্যাবলে রাজারানীর যোগ্য হীরের কবাট, চুনির চৌকাঠ, পান্নার জানলা, প্রবালের আলনা, মুক্তোর দেয়াল, ফটিকের ফোয়ারা, লোকজন সোনায় ঝকঝকে চেহারা—একটি মণি-মহল তৈরি করে, রাজাও চোখে দেখেন নি রাণীও কানে শোনেন নি এমন সব আশ্চর্য আশ্চর্য সুখাদ্য খাইয়ে, স্বর্গ থেকে গন্ধর্ব-অপ্সরাদের আনিয়ে নাচগান করিয়ে, আপ্যায়ন করবেন গুরু বশিষ্ঠের সে ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তিনি তা করলেন না। রাজা-রানী এখন তপস্যা করতে এসেছেন। তাঁদের থাকতে হবে নিয়মে-সংযমে, মুনির মতো। তাই গুরুর নির্দেশে পাতার কুটিরে পাতার বিছানায় বনের ফলমূল জল খেয়ে শুয়ে পড়লেন রাজা-রানী।

সকালবেলা যখন তাঁদের ঘুম ভাঙল, তখন দশ হাজার ছাত্রের বেদ পড়ার শব্দে গম গম করছে তপোবন, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ভেসে আসছে হাজার হাজার অচেনা পাখির বন-ভরানো, কান-ভরানো মন-ভরানো ডাক।

॥ দুই ॥

সুদক্ষিণা তাড়াতাড়ি উঠে স্নান করে নন্দিনীর পায়ে জল দিয়ে শিং ধুয়ে চন্দন মাখিয়ে মালা পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। তার বাছুরটিকে পেট ভরে দুধ খাইয়ে বেঁধে রাখা হলো। তারপর রাজা দড়ি খুলে নন্দিনীকে নিয়ে চললেন বনে। বিদায় দিলেন

রানীকে। বিদায় দিলেন অনুচরদের। একা। এখন নন্দিনীই তাঁর রাজ্য। তিনি তার রাখাল-রাজা।

কখনো তার মুখে ধরছেন সুস্বাদু খাসের গরস, কখনো চুলকে দিচ্ছেন গা, কখনো তাড়াচ্ছেন ডাঁশ-মশা-মাছি। নন্দিনী যেমন খুশি যেখানে খুশি চরছে, তিনি তার পেছনে-পেছনে চলেছেন ছায়ার মতো—এইভাবে সম্রাট সেই গরুর সেবা করতে লাগলেন। সম্রাটের মাথায় থাকে উষ্ণীষ, মুকুট, পরণে দামী পোষাক, গা-ময় দামী দামী গয়না, মাথার ওপর ধরা থাকে প্রকাণ্ড রাজছত্তর, হাতে থাকে রাজদণ্ড, দুপাশে চামর ঢোলায় কিঙ্করীরা, চারপাশে দেহরক্ষীরা খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দেয়। সেসব কিছুই এখন নেই দিলীপের। পরণে সাদাসিধে পোষাক, হাতে ধনুর্বাণ, মাথার চুলগুলি চুড়ো করে জড়িয়ে নিয়েছেন কি একটা বুনো লতা দিয়ে। কিন্তু তবু রাজা রাজাই। তাঁকে দেখে মনে হতে লাগল, তিনি যেন এই বিশাল বন-রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। দুষ্টু প্রাণীদের শায়েস্তা করতে এসেছেন মুনির হোমধেনুর রাখালি করার ছলে।

চোত্-বোশেখের দারুণ গরমে বনে প্রায়ই লাগে দাবানল। সে আগুন নিবে গেল দিলীপ বনে পা দিতে না দিতেই। বন ভরে ফুল ফুটে উঠল, ফল ফলে উঠল। দুপাশে বিশাল বিশাল গাছ, মাঝখান দিয়ে শালগাছের মতো উন্নত শরীর, বৃষস্কন্ধ, চওড়া বুক রাজা যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন গাছেরা জয়ধ্বনি দিচ্ছিল পাখি ডাকার ছলে। কিশোরী লতারা তাঁর গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছিল কুটি কুটি ফুল, ঠিক যেন খই ছড়াচ্ছে নগরের কিশোরী মেয়েরা। চোখ মেলে তাঁর সেই অপরূপ রূপ দেখতে দেখতে হরিণীরা মনে মনে ভাবছিল, এতদিনে বুঝলুম বিধাতা-ঠাকুর আমাদের চোখগুলোকে এত বড় বড় করেছেন কেন।

রাজপুরীতে রাজার স্তুতিগান গায় বৈতালিকের দল। এখানে কোথায় তারা? কিন্তু দিলীপ স্পষ্ট শুনতে পেলেন, বাঁশের বনে হু হু

হাওয়ায় বেজে উঠল বাঁশী, বনদেবতারা সমস্বরে গেয়ে উঠলেন তাঁর যশোগাথা। রোদে বুঝি একটু ক্লান্ত হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝরন্ত ফুলের গন্ধে ভুবভুর ঝরণার-জল-টুপটুপ ভিজে হাওয়া এসে মুছিয়ে দিল তার সব ক্লান্তি।

এমনি করে সারাদিন বনে ঘুরে ঘুরে, এক সময় কচিপাতার মতো লালটুকটুক রোদটি আর গরুটি একই সঙ্গে এ বললে ওকে—সুয্যি-ঠাকুর পাটে বসলেন, এবার ভাই বাড়ি যাই? মুনিঠাকুরের হোমের সময় হলো, এবার ভাই বাড়ি যাই। রাজা দেখলেন, ডোবা ছেড়ে কাদাভরা গা নিয়ে হেলেদুলে উঠে আসছে বুনো বরার দল। ময়ুরেরা যে-যার বাসা-গাছে ফিরে চলেছে। ঘাসে-ঢাকা জমির ওপর সার সার বসে গেছে হরিণেরা, আর সাঁঝের আঁধারে একটু একটু করে কালো হয়ে উঠছে বন। তখন নন্দিনীকে নিয়ে তপোবনের পথ ধরলেন রাজা।

সুদক্ষিণা সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন গোটা গোটা আলো-চাল এটা-ওটা দিয়ে সাজানো বরণডালাটি হাতে করে, বন থেকে তপোবনে ঢোকার লতায়-ঘেরা ফটকটির পাশে। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাসায় ফিরছে, ছাত্ররা সব কাঠের বোঝা মাথায়, কুশের আঁটি হাতে, ঝুড়ির মধ্যে ফলমূল কন্দ শাক—আশ্রমে ফিরছে। তারি মধ্যে সুদক্ষিণা দেখলেন, ধুলো উড়িয়ে ধীরে ধীরে আসছে নন্দিনী, আর তার পেছন পেছন ঐ যে তার রাজা। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল, ভরে গেল, অপলক চোখে সুদক্ষিণা দেখতেই থাকলেন, দেখতেই থাকলেন। দেখতে দেখতে যখন কাছে এল নন্দিনী, তখন সুদক্ষিণা আর দিলীপের মাঝখানে রাঙা গাইটিকে দেখাতে লাগল ঠিক যেন দিন আর রাতের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে রাঙা টুকটুক গোধূলি।

সুদক্ষিণা বরণ-ডালা হাতে নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ আর প্রণাম করে তার কপালে পুজো দিলেন। নন্দিনীর প্রাণটি ছটফট করছে বাছুরের জন্যে, তবু সে লক্ষ্মী হয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পুজো নিল—দেখে রাজা-

রানী বুঝলেন, সে খুশি হয়েছে।

বশিষ্ঠ ঠাকুর আর অরুন্ধতী-মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে, সন্দে-পুজো করে, দিলীপ সুদক্ষিণাকে নিয়ে আবার গেলেন নন্দিনীর কাছে। সে ওতক্ষণে বাছুরকে খাইয়ে, মুনির হোমের দুধ দিয়ে, বসে বসে বিশ্রাম করছে। নৈবেদ্যটি তার নাগালের মধ্যে গুছিয়ে রেখে প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাজারানী বসে রইলেন তার কাছে, যতক্ষণ না ঘুমোয়। ঘুমুলে পর উঠে শুতে গেলেন দুজনে। তারপর কাক-ভোরে আবার উঠে পড়লেন, সে জাগতে না জাগতেই।

এমনি করে কেটে গেল তিন সাত্‌তে একুশ দিন।

॥ তিন ॥

পরের দিন। রোজকার মতো দিলীপ বেরিয়েছেন নন্দিনীকে নিয়ে। চরতে চরতে নন্দিনী চলে গেল অ-নে-ক দূ-রে। জায়গাটি ভারী চমৎকার। হিমালয়ের ওপর থেকে নামছে গঙ্গার প্রপাত, মাটি দেখা যায় না, খালি মখমলের মতো সবুজ ঘাস আর ঘাস। একপাশে একটি গুহা। সেই গুহায় গিয়ে ঢুকল নন্দিনী। বাঘ-সিংগীর সাধ্যি কি, মনে মনেও নন্দিনীকে আক্রমণ করে, এই ভেবে রাজা নিশ্চিন্ত মনে সেই অপূর্ব শোভা দেখছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এক লহমার জন্যে একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়েছেন, হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে চমকে ঘুরে তাকিয়ে দেখেন, নন্দিনীর ঘাড়ের ওপর একটা ঝাঁকড়া-কেসর সিংহ—ঠিক যেন গেরুয়া উপত্যকায় ফুলে-ফুলে-ফুলন্ত একটা লোধ্রগাছের মতো—জাঁকিয়ে বসে আছে। কখন এল সিংহটা! কোত্থেকে এল! বিদ্যুৎ-গতিতে রাজার ডান হাত চলে গেল তীর-ভরা তূণে। কিন্তু এ কি! তীর ছুঁয়েই হাত যে আর নড়ে না!

মন্ত্র-পড়া সাপের মতো রাগে ফুঁসতে লাগলেন রাজা। কিন্তু কিছু-

তেই হাত আর একচুলও নাড়াতে পারলেন না। হাত যেন অবশ অসাড় পঙ্গু হয়ে গেছে। হঠাৎ রাজাকে অবাক করে দিয়ে সেই সিংহ মানুষের গলায় কথা কয়ে উঠল—

ক্ষান্ত হোন মহারাজ, কেন মিছে পরিশ্রম করছেন? আপনি মহাবীর জানি, কিন্তু আপনার অস্ত্র আমার ওপর খাটবে না।

উপড়োতে পারে বটে মস্ত গাছকে ঝড়,
তাই বলে নাড়া দিতে পারে সে কি এ-পাহাড়?

আমার পরিচয়টা আপনাকে দিই শুনুন, তাহলেই বুঝবেন কেন একথা বলছি। আমি হচ্ছি নিকুম্ভের বন্ধু কুম্ভোদর, আমরা দুজনেই শিবের কিঙ্কর। আমার পিঠে পা দিয়ে বাবা তাঁর কৈলাস-পাহাড়ের মতো ধবধবে ষাঁড়টিতে চড়েন, এত বাবার অনুগ্রহ আমার ওপর। ঐ যে সামনে দেখছেন দেবদারু গাছটি, ওটি সামান্য নয়। শিব ঠাকুর আর পার্বতী-মার ওটি ছেলের মতো। নিজের হাতে সোনার কলসের জল খাইয়ে ওকে মানুষ করেছেন মা। একদিন একটা বুনো হাতি গাল চুলকোতে এসে গাছের খানিকটা ছাল ছাড়িয়ে ফেললে। দেখে মায়ের সে কি কষ্ট! যেন অসুরদের হাতিয়ারে কাত্তিক-দাদার গায়ে চোট লেগেছে। তখন বাবা আমায় ডেকে—নিকুম্ভর সঙ্গে খুনসুটি করছিলুম, সেসব ফেলে আসতে হল, বাবার হাতে শূলটি যা ঝকঝক করছিল!—বললেন, কুম্ভোদর, সিংহ হও—আগে আমি এমনধারা ছিলুম না, বাবা বলার সঙ্গে সঙ্গে এইসব থাবা-টাবা কেসর-টেসর হলো—হয়ে আমার দেবদারুকে পাহারা দাও—

হাতি এলে বিরাট মুখ'—ভঙ্গি করে তাড়িয়ে দেবে,

তাতেও যদি না শোনে তো, আঁচড়ে দেবে, কামড়ে দেবে। আর খবরদার গাছ ছেড়ে নড়বে না, যেসব জানোয়ার আপনা আপনি তোমার থাবার মধ্যে এসে পড়বে, তাদেরই শুধু খাবে। ভয় নেই, আসবে, আসবে।

সেই থেকে এখানে আছি। রোজই আসে কিছু না কিছু, কেউ

না কেউ। আজ এই গরুটি এসেছে, রক্তে-মাংসে বেশ শাঁসালো রসালো আছে, ঠিক খাবার সময়টিও হয়েছে, খিদেও পেয়েছে দারুণ, এখন রাহু যেমন করে চাঁদকে খায়, ঠিক তেমনি করে একে খাব। তুমি ফিরে যাও রাজা, লজ্জার কি আছে ? যথেষ্ট গুরুভক্তি দেখিয়েছ। কিন্তু যা তোমার ক্ষমতার বাইরে, সেখানে তুমি আর কী করবে বল ? এতে তোমার কোনই নিন্দে হবে না।

সিংহ-রাজের কথা শুনে রাজ-সিংহ দিলীপ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, ওঃ, তাই বল, শিব-ঠাকুর হাত আটকে দিয়েছেন! তারপর বললেন, পশুরাজ ,এই সৃষ্টিটাকে যিনি হাতের পুতুলটার মতো ভাঙেন-গড়েন পালেন-পোষেণ, সেই দেবাদিদেবকে তো আমি অমান্য করতে পারি না। এদিকে আমার গুরুর ধন এই হোমধেনু একেও তো চোখের সামনে মরতে দিতে পারি না। তাই বলছি, তুমি গরুটিকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে খাও। আহা ওর ছোট্ট বাছুরটি মায়ের জন্যে কত ছটফট করছে।

রাজার কথা শুনে সিংহ হাসল। তার দাঁতের জেল্লায় গুহার আঁধার যেন খান খান হয়ে গেল। সিংহ বললে—

জগৎ-জোড়া এক-ছত্তর রাজ্য তোমার, রাজা,
শরীরটি লাবণ্য-ভরা, বয়েসটিও কাঁচা।
সামান্য এক গরুর জন্যে সব হারাবে ? এ কি!
রাজা, তোমার বুদ্ধি বড়ই গোলমেলে, দেখি।
জীবে দয়া ? তাই যদি হয়,
একটি গরুই পাচ্ছে অভয়—
করলে শরীর-দান,
বাঁচলে পরে বাবার মত
করবে অমন প্রজায় কত
বিপদ্ থেকে ত্রাণ।

রাগে আগুন গুরু-ঠাকুর
হবেন, ক্ষতি হলে গরুর—
এই কি তোমার ভয় ?
রাগ পড়িও তাহলে ভাই
কয়েক কোটি ছুধোলো গাই
দান করে না—হয়।
বাঁচলে পরে ভালো হবে একের পরে আরো,
তাই বলি ভাই, এই দশাসই শরীরটিকে রাখো।
এই পৃথিবীর ইন্দ্র হয়ে ভোগ করো, রাজন্,
স্বর্গ-সম ঋদ্ধ তোমার সাম্রাজ্য-ধন।

সিংহ যখন থামল, তখনো তার কথার প্রতিধ্বনিতে গমগম করতে লাগল গুহা যেন তার কথায় খুশি হয়ে জোর গলায় সায় দিচ্ছে হিমালয়। আর নন্দিনী ? করুণ কাতর চোখ ছুটি মেলে সে তাকিয়ে রইল রাজার দিকে! রাজা দয়ায় গলে গিয়ে বললেন—

ক্ষত থেকে ত্রাণ করে, তাই ক্ষত্রিয় নাম।
করে না যে কাপুরুষ, কলুষিত তার প্রাণ
ছি ছি ছি ছি ছি ছি ছি ছি ধিক্কার-বাক্যে—
সে প্রাণে কাজ কি তার ? কাজ কি বা রাজ্যে ?

যে-সে নয়, এ স্বয়ং সুরভির কন্যা,
ক্ষমতায় তার চেয়ে একচুলও কম না।
ধরেছ শিবের জোরে, সাধ্য কি নইলে ?
কোটি পেয়ে ঋষি নয় খুশি, এটি নইলে।

তাই বলি, ছেড়ে দাও ধেনুটিকে ফিরতে,
দিচ্ছি এ-দেহ দাম তার পরিবর্তে।
উপোসের শেষে হবে তোমারও পারণ তো,

চলবে মুনিরও হোম-ক্রিয়া অফুরন্ত।
তোমারও মনিব আছে, তুমিও তো জান ভাই,
কত-না যত্ন কর এ-দেবদারুকে তাই!
গাছকে মরতে দিয়ে, নিজে বিনা ফাঁড়াতে

পারবে কি গিরিশের মুখোমুখি দাঁড়াতে?
নেহাৎই আমাকে যদি অ-বধ্য বলে ধর,
তাহলে আমার যশো-দেহটিকে দয়া কর।
একদিন যাবেই যা ধ্বংসের কুণ্ডে
আমার মমতা নেই
পাঁচ-ভূতে গড়া সেই
মাংসের পিণ্ডে।
কথা-বলা থেকে নাকি ভাব হয় দুজনের,
হয়েছে তা এই বনে আমাদের দুজনের।
স্বয়ং শিবের তুমি কাছাকাছি, নও দূর,
বন্ধু হে, রাখ রাখ এ-মিনতি বন্ধুর।

সিংহ বলল, বেশ তবে তাই হোক। বলার সঙ্গে সঙ্গে রাজার হাত আবার ঠিক হয়ে গেল। কাঁধ থেকে ধনুর্বাণ-তূণ খুলে নিয়ে পাশে রেখে দিলেন রাজা। তারপর হাঁটু গেড়ে মাথাটি নিচু করে বসলেন, যেন তাঁর শরীর নয়, একতাল মাংস—খাবার জন্যে ধরে দিচ্ছেন সিংহকে।

এক্ষুনি সিংহ লাফিয়ে পড়ে কামড়ে ধরল বলে ঘাড়টা, রাজা অপেক্ষা করছেন, এমন সময় একি! গায়ে-মাথায় এত ফুল পড়ছে কোথেকে? অবাক হয়ে মুখ তুলে রাজা দেখলেন, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীরা মেঘের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে দুহাতে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। কোথায় সিংহ, কোথায় কি! ঠিক আপন মায়ের মতো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নন্দিনী, দুধের ধারা বয়ে যাচ্ছে তাঁর বুক ছাপিয়ে, স্নেহের

অমিয়-মাখা স্বরে বলছেন, ওঠ বাবা ওঠ। মায়া-বলে সিংহ তৈরি করে আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলুম। ঋষির প্রভাবে যমও আমায় ছুঁতে পারে না, অন্য জানোয়ার তো দূরের কথা। গুরুর ওপর তোমার ভক্তি এবং আমার ওপর দয়া দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি বাবা। কী বর চাও, বল—

দুধ দি' শুধু তা ভেবো না, নইকো শুধুই দুধ্‌লো গাই।

কামধেনু-মা, তুষ্ট হলে দিই যেটি যার ইচ্ছে তাই।

তখন, যে-দিলীপ এতদিন ধরে কত প্রার্থীর প্রার্থনা পূরণ করেছেন, সেই তিনি দুটি হাত জোড় করে বললেন, মা, সুদক্ষিণাকে একটি পুত্র দাও। সে যেন প্রতিষ্ঠা করে নতুন বংশ, আর তার কীর্তি যেন হয় অফুরন্ত।

নন্দিনী বললেন, তথাস্তু। একটি পাতার ঠোঙায় আমার দুধ দুয়ে নিয়ে খাও বৎস।

দিলীপ বললেন, মা, তোমার বাছুরটির এখনো খাওয়া হয় নি। মুনির হোমও বাকি। আমি কি করে খাই?

রাজার একথা শুনে নন্দিনী এত খুশি হলেন যে বলার নয়। তারপর তাঁর সঙ্গে সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে চললেন তপোবনের দিকে।

রাজার মুখ-চোখ দেখে কিছু আর বুঝতে বাকি ছিল না বশিষ্ঠ-ঠাকুরের আর সুদক্ষিণার। তারপর রাজা যখন সব খুলে বললেন আগে গুরুকে, তারপর রানীকে, তখন তাঁদের আনন্দের সীমা রইল না। বাছুরের খাওয়া এবং গুরুর হোম হয়ে যাবার পর, গুরুর অনুমতি নিয়ে রাজা নন্দিনীর দুধ খেলেন, যেন অনেক দিনের নির্জলা উপোসের পর পান করছেন অমৃত।

পরের দিন ব্রতের শেষে পারণ করিয়ে, শান্তি-স্বস্তেন করে গুরু তাঁদের যাবার আয়োজন করে দিলেন। যজ্ঞের আগুন, বশিষ্ঠ-ঠাকুর, অরুন্ধতী-মা এবং বাছুর- সমেত নন্দিনীকে প্রদক্ষিণ এবং প্রণাম করে

রাজা-রানী উঠলেন রথে। কি সুন্দর কি উজ্জ্বল কি পবিত্র যে দেখাচ্ছিল তাঁদের।

এর কয়েক মাস পরেই এক শুভদিনে সুদক্ষিণার একটি ঘর-আলো-করা ছেলে হলো। ঘরেতে জ্বলছিল রাতের পিদিম, তাদের হঠাৎ মনে হলো যেন শিখা নেই, আলো নেই, পটে-আঁকা, এমনি সে-ছেলের তেজ।

রাজা ছেলের নাম রাখলেন রঘু।

নন্দিনীর বর সফল হয়েছিল।

রঘু যখন যুবরাজ হলেন, তখন অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দারুণ যুদ্ধ হয়েছিল। তাঁর বীরত্ব দেখে খুশি হয়ে ইন্দ্র তাঁকে বর দিয়েছিলেন, তোমার নামে নাম হবে তোমার বংশের। সেই থেকে ইক্ষ্বাকু-বংশের নাম হল রঘুবংশ। আর সত্যিই রঘুর কীর্তিরও শেষ ছিল না। সমস্ত ভারতবর্ষ এবং পারস্য জয় করেছিলেন, তারপর বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করে তাঁর সর্বস্ব দান করে দিয়েছিলেন। সে সব আরেক কাহিনী।

রঘুবংশের রাজাদের গুণে মুগ্ধ হয়ে এক মহাকাব্য লিখলেন মহাকবি কালিদাস। তার নাম 'রঘুবংশম্'। রঘুর ছেলে অজ, তাঁর ছেলে দশরথ, তাঁর ছেলে রাম, তাঁর ছেলে লব-কুশ—এঁদের সবারই গল্প আছে সেই বইয়ে, যেমন আছে রঘুর জন্মের এই কাহিনী।

অভিজ্ঞান শকুন্তলা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পুরুবংশের এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন দুষ্যন্ত। অনেকে তাকে দুষ্মন্ত বলেও ডাকত। রাজা দুষ্মন্ত অসাধারণ বীরপুরুষ, তার বিশাল রাজত্বে কোথাও কোন অশান্তি নেই। চোর-ডাকাতরাও রাজার ভয়ে শান্ত হয়ে গেছে।

কিন্তু রাজা নিজে শান্ত থাকতে পারেন না। যারা বীরপুরুষ, সব সময় লড়াই করার জন্য তাদের হাত নিশপিশ করে। আর কোনো শত্রু নেই বলে রাজা দুষ্মন্ত প্রায়ই বেরিয়ে পড়েন শিকার করতে। সেই রকম একবারের শিকার অভিযান থেকেই এই গল্পের শুরু।

শিকার করার সময় রাজার আহার-নিদ্রা-বিশ্রামের কথা খেয়াল থাকে না। যে-পশুকে তিনি তাড়া করবেন, তাকে শেষ পর্যন্ত না মেরে তিনি থামবেন না।

একদিন গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি কৃষ্ণসার মৃগ রাজার সঙ্গে খুব লুকোচুরি খেলতে লাগল। রাজা তাকে কিছুতেই মারতে পারছেন না। রথের ওপর তিনি ধনুকে বাণ জুড়ে মহাদেবের মতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর সেই কৃষ্ণসার মৃগটি একবার তার চোখের সামনে আসছে, আবার হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। রাজা তাঁর সারথিকে বললেন আরও জোরে রথ ছোটাতে।

রাজার সৈন্যসামন্তরা রইল অনেক পেছনে পড়ে, আর রাজার রথ সেই কৃষ্ণসার মৃগটির পিছু পিছু ধাওয়া করে চলে এল গভীর

গভীরতর বনে। তারপর একসময় রাজা হরিণটিকে মারবার জন্য যেই ধনুক উঁচু করেছেন, অমনি কয়েকজন তপস্বী রথের সামনে এসে পড়ে হাত তুলে অনুনয় করে বললেন, মহারাজ, মারবেন না, মারবেন না! এরা আশ্রমের মৃগ। আপনি এত বড় বীর হয়ে কেন নিরীহ কোমল হরিণদের মেরে ফেলবেন!

রাজা দুষ্যন্ত অবাক হয়ে ধনুক নিচু করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কার আশ্রম?

তপস্বীরা বললেন, সামনেই মালিনী নদী। তার তীরে মহর্ষি কণ্বের আশ্রম। সেই আশ্রমের নাম তপোবন।

তপোবন অতি শান্তির জায়গা। সেখানে জীবজন্তু হত্যা করা নিষেধ। তাই রাজা লজ্জিত হয়ে রথ থেকে নেমে পড়লেন।

তারপর রাজা ভাবলেন, এতদূরেই যখন এসে পড়েছেন, তখন একবার তপোবনে গিয়ে মহর্ষি কণ্বকে প্রণাম করে আশা উচিত। তিনি তীর ধনুক রথের ওপর নামিয়ে রাখলেন, কোমর থেকে তলোয়ার খুলে ফেললেন। তারপর সারথিকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে পায়ে হেঁটে চললেন তপোবনের দিকে।

খানিক দূর গিয়েই রাজা বুঝলেন, তিনি তপোবনে পৌঁছে গেছেন। সেখানে ভারি সুন্দর গন্ধ, গাছে গাছে কত রকম পাখি, পাথরগুলি মসৃণ আর সেখানকার হরিণরা রাজাকে দেখে একটুও ভয় পাচ্ছে না।

পায়ে পায়ে রাজা এগিয়ে গেলেন আশ্রমের দিকে। সামনে একটি ঝোপের আড়ালে কয়েকটি মেয়ে কথা বলছে। রাজা সেখানে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন ওদের কথা।

সেখানে ছিল তিনটি মেয়ে। একজন হলো কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলা, আর দু'জনের নাম অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদা। তিন সখীতে দারুণ ভাব। এই শকুন্তলাকে ঋষি কণ্ব একদিন নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। মেনকা নামে স্বর্গের এক অপ্সরা এই শকুন্তলার মা। জন্মের পর কোনো কারণে মেনকা তার মেয়েকে



নদীর ধারে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। মুখে রোদ লাগায় হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছিল শিশু কন্যাটি। তাই দেখে বনের পাখিদের খুব মায়া হয়েছিল। তারা ডানা মেলে রোদ আড়াল করেছিল শকুন্তলার মুখ থেকে। সেই অবস্থায় কন্বমুনি তাকে দেখতে পান। শকুন্ত কথাটার মানে হলো পাখি। পাখিরা আশ্রয় দিয়েছিল বলে মেয়েটির নাম রাখা হলো শকুন্তলা। কন্বমুনি তাকে আশ্রমে এনে নিজের মেয়ের মতন মানুষ করতে লাগলেন।

সেই শকুন্তলা এখন বড় হয়েছে। সখীদের সঙ্গে মিলে শকুন্তলা আশ্রমের নানান কাজ করে, গাছে জল দেয়, পশুপাখিদের সেবা করে। এদের খুব সুন্দর সুন্দর নাম দেয় সে। যেমন, একটা মাধবীলতার নাম সে দিয়েছে বনজ্যোৎস্না।

রাজা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শুনছেন, এমন সময় শকুন্তলা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঁচাও, বাঁচাও, এই দস্যুটার হাত থেকে আমায় কেউ বাঁচাও!

রাজা ভাবলেন, শকুন্তলা বুঝি কোনো বিপদে পড়েছে। তাই তিনি ঝোপ ঝাড় ঠেলে সেখানে ঢুকে পড়লেন। আসলে কিন্তু কিছুই হয় নি, শকুন্তলা তার সখীদের সঙ্গে কৌতুক করছিল। একটা ভ্রমর উড়ে উড়ে বসছিল তার ঠোঁটের কাছে, তাই শকুন্তলা চেঁচিয়ে উঠেছিল ঐ ভাবে।

রাজাকে দেখে মেয়ে তিনটি লজ্জা পেয়ে গেল, অবাকও হলো খুব। রাজা দুষ্যন্ত তখুনি নিজের পরিচয় দিলেন না। কিন্তু তিনি যে একজন বেশ হোমড়া চোমড়া রাজপুরুষ, তা তো তাঁর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। রাজা বললেন, তিনি এই আশ্রমের অতিথি।

সেই সময় মহর্ষি কন্ব আশ্রমে ছিলেন না। দূরে কোথাও গিয়েছিলেন। তিনি না থাকলে অতিথি সেবার ভার পড়ে শকুন্তলার ওপর। শকুন্তলা এবং তার দুই সখী রাজাকে একটা পাথরে বসতে

অনুরোধ করে ফলমূল এনে দিল। রাজা ওদের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন।

শকুন্তলার রূপ দেখে আর তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে রাজার মনে হলো, এমন সরল, সুন্দর মেয়ে তিনি আগে কখনো দেখেন নি। তাঁর খুব পছন্দ হলো শকুন্তলাকে। শকুন্তলারও খুব ভাল লেগেছে রাজাকে। তখনকার দিনে পরস্পর মালা বদল করে গান্ধর্ব মতে বিয়ে হতে পারত। পরদিন রাজা সেই নিয়মে বিয়ে করলেন শকুন্তলাকে। তপোবনের সবাই এই বিয়েতে খুব খুশি হলেন।

রাজা দুষ্যন্ত কয়েকদিন রইলেন সেই তপোবনে। মহর্ষি কন্ব তার মধ্যেও ফিরলেন না। রাজা তো আর বেশিদিন রাজধানী ছেড়ে বাইরে থাকতে পারেন না। তাই তাঁকে একদিন ফিরে যেতে হলো। যাবার সময় তিনি বলে গেলেন যে খুব তাড়াতাড়ি তিনি সুন্দর করে সাজানো মস্ত বড় রথ এবং হাতি-ঘোড়া সমেত বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেবেন, তারা এসে সসম্মানে শকুন্তলাকে নিয়ে যাবে তাঁর রাজধানী হস্তিনাপুরে। আর তিনি শকুন্তলার হাতে পরিয়ে দিয়ে গেলেন তার নাম লেখা একটি সুন্দর আংটি।

রাজা চলে যাবার পর শকুন্তলার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সে সব সময় চুপ করে বসে থাকে আর রাজার কথা ভাবে। সেই সময় কেউ তার সামনে এলে কিংবা কথা বললেও তার খেয়াল হয় না। এই রকম অবস্থায় হঠাৎ শকুন্তলার একটি সাঙ্ঘাতিক বিপদ হয়ে গেল।

দুর্বাসা নামে এক ঋষি ছিলেন খুব রাগী। কারুর ব্যবহারে একটু পান থেকে চুন খসলেই তিনি অভিশাপ দিয়ে বসেন। সেই দুর্বাসা মুনি হঠাৎ এই সময় এসে হাজির হলেন তপোবনে। কন্বমুনির কুটিরের দরজার কাছে শকুন্তলা তখন এক মনে রাজার কথা ভাবছেন। দুর্বাসা সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, অয়ম অহ ভোঃ। অর্থাৎ, ওহে, এই যে আমি এসেছি।

শকুন্তলা সে কথা শুনতেও পেলেন না, মুখ তুলে তাকালেনও না।

দুর্বাসা দু'তিনবার উচ্চারণ করলেন সেই কথা। শকুন্তলা কোনো সাড়া দিচ্ছে না দেখে তিনি অমনি রেগে আগুন হয়ে গেলেন। আঙ্গুল তুলে অভিশাপ দিলেন, তুমি যার কথা এমনভাবে ভাবছ, সে তোমায় দেখলে চিনতেই পারবে না!

অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদা তখন ফুল তুলতে গিয়েছিল। তারা দূর থেকে দেখল, দুর্বাসা মুনি হন্ হন্ করে ফিরছেন। ভাব দেখেই তারা বুঝলো যে দুর্বাসা মুনি খুব রেগে আছেন আর একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড বাধিয়েছেন। তারা দৌড়ে গিয়ে দুর্বাসা মুনির পায়ে কেঁদে পড়ল। তারা বলল, হে প্রভু, শকুন্তলার মন ভাল নেই, তাই সে বোধহয় আপনার কথা শুনতে পায় নি। তবে এই তো ওর প্রথম অপরাধ, তাই ওকে এবারকার মতন ক্ষমা করুন আপনি।

সখী দু'জনের কাকুতি-মিনতি শুনে একটু নরম হলো দুর্বাসার মন। তিনি বললেন, আমার অভিশাপ তো আর ফেরানো যায় না। তবে একটা উপায় বলে দিয়ে যাচ্ছি। শকুন্তলাকে যে চিনতে পারবে না বলেছি, সেই তাকে যদি কোনো অভিজ্ঞান অর্থাৎ চিহ্ন দেখানো যায়, তা হলে সে আবার চিনতে পারবে।

অনুসূয়া আর প্রিয়ংবদা এতে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। রাজার চিহ্ন অর্থাৎ রাজার আংটি তো শকুন্তলার হাতে আছেই। এই অভিশাপের কথা তারা আর কারুকে বলল না। এমনকি শকুন্তলাও জানল না দুর্বাসা মুনির অভিশাপের কথা।

॥ দুই ॥

কিছু দিন পরে কন্বমুনি ফিরে এলেন আশ্রমে। শকুন্তলার বিয়ের খবর শুনে তিনি খুশি হলেন খুব। তিনি শকুন্তলার বরের খোঁজেই নানান জায়গা ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। রাজা দুষ্যন্তের চেয়ে আর কে বেশি যোগ্য স্বামী হতে পারে শকুন্তলার?

কিন্তু রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে নিয়ে যাবার জন্য রথ আর সৈন্য সামন্ত পাঠাচ্ছেন না কেন? তিনি যে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন! মাসের পর মাস কেটে যাচ্ছে। শকুন্তলার সন্তান জন্মাবারও সময় এগিয়ে আসছে। তখন কন্বমুনি ভাবলেন, তিনি নিজেই আশ্রমের লোকদের সঙ্গে শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক হলো, শকুন্তলার পিসী গৌতমী এবং শাঙ্গরব এবং শারদ্বত নামে দু'জন ঋষি যাবেন শকুন্তলাকে নিয়ে।

শকুন্তলার বিদায় দৃশ্যটি বড় করুণ।

শকুন্তলা এই তপোবন ছেড়ে কখনো বাইরে যান নি। এই আশ্রমের প্রতিটি মানুষ, সমস্ত পশুপাখি এবং গাছপালাকে সে যেমন ভালবাসে, তারাও সকলে তেমনই ভালবাসে তাকে। আজ তার যেমন আনন্দের দিন, তেমনই দুঃখের দিন। আশ্রমের সবাই চায় যে রাজার কাছে গিয়ে শকুন্তলা সুখে থাকুক, আবার শকুন্তলা চলে যাবে বলে তাদের প্রাণ কাঁদছে।

মহর্ষি কন্বের মন খুব খারাপ কিন্তু তিনি সেটা মুখে প্রকাশ করছেন না। রাজবাড়িতে গিয়ে শকুন্তলার কী রকম ব্যবহার করা উচিত সকলের সঙ্গে, সে সম্পর্কে কিছু উপদেশ দিলেন। অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা কেঁদে ফেলছিল বলে তিনি বললেন, ছিঃ, ওরকম করতে নেই। তোমরা কাঁদলে যে শকুন্তলা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে!

তপোবনের গাছেরা শকুন্তলাকে উপহার দিল নানারকম অলঙ্কার আর বসন। গাছের ডাল ও পাতাগুলি এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন তারা শকুন্তলার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। পাখিরাও ডেকে উঠল সেই ভাবে। শকুন্তলা কয়েক পা এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন টেনে ধরল তার শাড়ির আঁচল। শকুন্তলা মুখ ফিরিয়ে দেখল, একটি হরিণশিশু কামড়ে ধরেছে তার শাড়ির আঁচল। জন্মের সময়ই এই হরিণশিশুটির মা মারা যায়। তখন শকুন্তলাই ওকে বুকে তুলে নিয়ে মায়ের মতন স্নেহে ওকে লালন

পালন করেছে। শকুন্তলা কেঁদে ফেলে বলল, ওরে, আর আমার সঙ্গে আসছিস কেন! ফিরে যা। আমি চলে যাচ্ছি। এখন থেকে অন্যরা তোকে দেখবেন!

এক সরোবরের তীর পর্যন্ত আশ্রমের সবাই ওদের পৌঁছে দিতে এল। তারপর মহর্ষি কন্ব আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন ওদের।

কয়েকদিন ধরে পায়ে হাঁটা পথ ধরে এগিয়ে চলল ওরা। মাঝখানে একটা তীর্থস্থান পড়ায় সেখানকার সরোবরে স্নান করে নিল। তারপর আবার চলল। এইরকম ভাবে একদিন এসে পৌঁছলো হস্তিনাপুরে।

সেইদিন রাজা দুষ্যন্ত রাজসভায় কাজ সেরে ভেতরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এমন সময় প্রতিহারী এসে খবর দিল যে দু'জন সন্ন্যাসী আর দু'জন মহিলা এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। রাজা একটু অবাক হলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীরা এলে তখুনি দেখা করতে হয়। তাই আবার বিশ্রাম নষ্ট করে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। এবং সসম্মানে ঋষিদের নমস্কার জানালেন।

ঋষি দু'জন রাজার নামে জয়ধ্বনি করে বললেন, আমরা মহর্ষি কন্বের কাছ থেকে আপনার জন্য বার্তা এনেছি।

রাজা বললেন, মহর্ষি কন্ব কী আজ্ঞা করেছেন, বলুন?

শাঙ্গরব বললেন, মহর্ষি কন্ব জানিয়েছেন যে আপনি তাঁর মেয়ে শকুন্তলাকে বিয়ে করেছেন। সেজন্য তিনি খুশি হয়েছেন। শকুন্তলাও যোগ্য স্বামী পেয়েছে। এবার আপনি শকুন্তলাকে আপনার স্ত্রী হিসেবে রাজপুরীতে গ্রহণ করুন।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, শকুন্তলা! সে কে?

শকুন্তলা আঁচলে মুখ ঢেকে লাজুক ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল এক পাশে। রাজার মুখে এই কথা শুনে সে ভয়ে কেঁপে উঠল।

শাঙ্গরবও অবাক হয়ে বললেন, আপনি শকুন্তলাকে চিনতে পারছেন না? তপোবনে গিয়ে আপনি তাকে বিয়ে করেছিলেন।

রাজা বললেন, এ কী অদ্ভুত কথা বলছেন আপনারা! আমি আবার তপোবনে গিয়ে বিয়ে করলাম কবে ?

শাঙ্গরব এবার রেগে গিয়ে বললেন, মহর্ষি কন্ব বিশ্বাস করে তাঁর মেয়েকে এখানে পাঠিয়েছেন। আর আপনি তার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করছেন ? ছি ছি!

গৌতমী তখন তাড়াতাড়ি শাঙ্গরবকে বাধা দিয়ে বললেন, দাঁড়াও! শকুন্তলার মুখের আঁচল সরিয়ে দিলে তাকে দেখলেই নিশ্চয় রাজা চিনতে পারবেন!

রাজা শকুন্তলার মুখ দেখেও তাঁকে চিনতে পারলেন না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, মেয়েটি খুব সুন্দরী বটে। কিন্তু একে তো তিনি কখনো দেখেন নি। এ নিশ্চয় অন্য কারুর স্ত্রী। তিনি কোনো কথা বললেন না।

তখন অন্য ঋষিটি শকুন্তলাকে বললেন, শকুন্তলা, তুমি তো নিজেই রাজাকে বিয়ে করেছিলে, এবার তুমি নিজেই রাজার কাছে নিজের পরিচয় দাও!

শকুন্তলা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, হে পুরুবংশীয় রাজা, আপনি পবিত্র তপোবনে শপথ নিয়ে আমায় বিয়ে করেছিলেন। এখন আপনি আমায় ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। এ কি আপনার বংশের পক্ষে উচিত কাজ ?

রাজা বললেন, ছি ছি! এসব কথা শুনলেও পাপ। আমি আবার আপনাকে বিয়ে করলাম কবে ?

এ কথা শুনে শকুন্তলা লজ্জায়, দুঃখে, রাগে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল। তবু সে বলল, আপনি আমাকে আপনার নাম লেখা একটি আংটি দিয়েছিলেন, সেটা দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন।

কিন্তু শকুন্তলা হাত খুলে দেখল, আঙুলে আংটিটা নেই। সে অবাক হয়ে গৌতমীর দিকে তাকাল। গৌতমী বললেন, শচীতীর্থে

সরোবরে যখন স্নান করছিলে সেই সময় নিশ্চয়ই আংটিটা খুলে জলে পড়ে গেছে।

ওরা আংটিও দেখাতে পারল না বলে রাজা ঠাট্টা করে হেসে উঠলেন।

শকুন্তলা বললেন, আচ্ছা, আমি অন্য প্রমাণ দিচ্ছি। একদিন আপনি তপোবনে একটি হরিণশিশুকে জল খাওয়াতে চাইছিলেন। সে কিছুতেই আপনার হাত থেকে জল খাবে না। তারপর আমি যেই জলের পাত্রটা এগিয়ে দিলাম, অমনি সে খেয়ে নিল। তখন আপনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, তোমরা দু'জনেই তো বনের প্রাণী, তাই ও তোমাকে বিশ্বাস করে। এ কথা আপনার মনে নেই ?

রাজা হাসতে হাসতে বললেন, ওঃ, মেয়েরা যে কত রকম বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথাই বলতে পারে !

গৌতমী বললেন, মহারাজ, ও কথা বলবেন না। শকুন্তলা অতি সরলমেয়ে। সে মিথ্যে কাকে বলে জানে না।

রাজা তবু হাসতে লাগলেন !

শকুন্তলা তখন রাগে জ্বলে উঠে বললেন, যে নিজে খারাপ, সে অন্যদেরও খারাপ দেখে।

শাঙ্গরবও বলল, রাজাদের কাজই হলো অন্যদের ঠকানো। তপোবনবাসীরা কারুকে ঠকাতে জানে না।

এরপর তর্ক বিতর্ক চলতে লাগল।

রাজা কিছুতেই শকুন্তলাকে স্ত্রী হিসেবে রাজবাড়িতে রাখবেন না। আর ঋষিরাও শকুন্তলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন না। মহর্ষি কন্ব শকুন্তলাকে রাজার কাছে রেখে যাবার কথা বলেছেন, ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা তো বলেন নি !

শেষ পর্যন্ত ঋষিরা যখন শকুন্তলাকে ফেলেই চলে যেতে লাগলেন। সেই সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড হলো। হঠাৎ যেন একটা ঘূর্ণি ঝড়

উঠল। আকাশ থেকে আলো দিয়ে গড়া এক নারী নেমে এল। তারপর শকুন্তলাকে কোলে নিয়ে শূন্যে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার। সব ব্যাপারটা ঘটে গেল ঠিক এক মুহূর্তের মধ্যে।

॥ তিন ॥

এরপর পাঁচ ছ' বছর কেটে গেছে।

একদিন একটা লোক রাজধানীর খুব বড় একটা গয়নার দোকানে এসেছে একটা সোনার আংটি বিক্রি করতে। লোকটা পরে আছে একটা ময়লা পোষাক, অথচ তার কাছে অমন দামী একটা আংটি দেখে দোকানদারের সন্দেহ হলো। সে খবর দিল নগর-কোটালকে।

কোটাল এসে দেখল, সেই আংটিতে রাজার নাম লেখা। তখন সে লোকটাকে চোর সন্দেহ করে মারতে লাগল খুব। লোকটি কাঁদতে কাঁদতে জানাল যে সে চোর নয়। সে আংটিটা পেয়েছে একটা মস্ত বড় রুইমাছের পেটে থেকে। সে জাতে জেলে। মাছ ধরাই তার পেশা।

কোটাল গন্ধ শুঁকে দেখল, সত্যিই আংটিটার গায়ে মাছের গন্ধ। তখন সে আংটিটা নিয়ে গেল রাজার কাছে।

রাজা আংটিটা দেখেই চিনতে পারলেন। এই আংটিটাই তিনি দিয়েছিলেন শকুন্তলাকে। আংটিটা হাতে নেওয়া মাত্রই কেটে গেল দুর্বাসা মুনির অভিশাপ। সব কথা মনে পড়ে গেল রাজার। তিনি শকুন্তলাকে অপমান করে ফিরিয়ে দিয়েছেন বলে দারুণ অনুতাপ হলো তাঁর। তিনি কাঁদতে লাগলেন।

এরপর থেকে রাজার আর একটুও মন রইল না রাজকার্যে। তিনি সব সময় শকুন্তলার কথা ভাবেন আর চোখের জল ফেলেন। শকুন্তলার একটি ছবি এঁকে সেইদিকে তাকিয়ে থাকেন সব সময়।

তপোবন আশ্রমের সরল মেয়ে শকুন্তলা। না জেনে তার মনে কতখানি আঘাত দিয়েছেন রাজা। সেই কথা ভেবেই তাঁর মনে আরও বেশি কষ্ট। রাজসভায় সকলের সামনে শকুন্তলাকে কী অপমানই না সইতে হয়েছে! রাজাতো জানেন না দুর্বাসা মুনির অভিশাপের কথা। তাই তিনি ভাবেন, সবটাই তাঁর নিজের দোষ।

শকুন্তলার খোঁজে নানা দিকে লোক পাঠান হলো। কিন্তু কেউই শকুন্তলার কোনো সন্ধান আনতে পারল না।

রাজার জন্য সমস্ত রাজ্যই নিরানন্দ। রাজা সমস্ত উৎসব বন্ধ করার হুকুম দিয়েছেন। রাজার দুঃখে প্রজারাও দুঃখ বোধ করে। কেউ জোরে কথা বলে না পর্যন্ত।

এমনিভাবে দিন কেটে যেতে লাগল।

একদিন রাজার বন্ধু মাণ্ডি একটা গম্বুজের চূড়া থেকে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। বাঁচাও, বাঁচাও! কে আছ, বাঁচাও! আমায় মেরে ফেলল!

বাগানে বসে রাজা এই চিৎকার শুনে অবাক হলেন। তাঁর ধারণা, তাঁর রাজ্যে কোনো অশান্তি নেই। কোনো শত্রু, এমনকি কোনো চোর-ডাকাতও তাঁর রাজ্যে উপদ্রব করতে সাহস পায় না। কিন্তু তাঁর রাজপুরীর মধ্যেই কে এসে কাকে মারছে?

তিনি ডাকলেন, প্রতিহারী!

এর মধ্যেই আবার চিৎকার শোনা গেল, উঃ! আমি শেষ হয়ে গেলুম! বাঘ যেমন রক্ত খাবার জন্য ছোট প্রাণীকে মারে, সেই রকম একজন আমায় শেষ করে ফেলল!

এই সময় প্রতিহারী এসে উপস্থিত হতেই রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার এসব?

প্রতিহারী বলল, কিছুই বুঝতে পারছি না, মহারাজ! কোন এক অদৃশ্য শত্রু যেন এসে আপনার বন্ধু মাধব্যকে মেরে শেষ করে দিচ্ছে।

রাজা রাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, অদৃশ্য শত্রু ? আমার রাজপুরীতে ? কোনো শত্রুকে আমি গ্রাহ্য করি না ! আমার তীর ধনুক এনে দাও !

অনেকদিন পর মহাবীর রাজা দুষ্যন্ত আবার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দৌড়ে উঠে গেলেন গম্বুজের মাথায়। সেখানে গিয়ে দেখলেন, মাধব্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কিন্তু তার আক্রমণকারীকে চোখে দেখা যাচ্ছে না।

রাজা তখন ধনুকে শব্দভেদী বাণ জুড়লেন।

সেই মুহূর্তে দেখা গেল মাধব্যের পাশে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখে হাসি। রাজা তাঁকে দেখেই চিনতে পারলেন। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের রথের সারথি, এঁর নাম মাতলি।

রাজা ধনুক নামিয়ে বললেন, এ কি, আপনি ? স্বাগতম !

মাতলি বললেন, আমি ইন্দ্রের কাছ থেকে আপনার জন্য একটি বিশেষ খবর নিয়ে এসেছি। অসুররা আবার স্বর্গ আক্রমণ করেছে। সেই জন্য যুদ্ধে ইন্দ্র আপনার সাহায্য চান।

রাজা বললেন, ভাল কথা, আমি নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু আপনি ঐ নিরীহ মাধব্যকে অমন মারধর করছিলেন কেন ? ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছিলেন ?

মাতলি বললেন, না। আমি এসে দেখলাম আর শুনলাম যে আপনি বাগানে বসে সব সময় শুধু কাঁদেন আর কোনো রকম রাজকার্য করেন না। এই অবস্থায় তো আপনি যুদ্ধ করতে পারতেন না। সেইজন্য আপনাকে একটু রাগিয়ে দিলাম। খোঁচা দিলে যেমন সাপ ফণা তোলে। সেইরকম বীরপুরুষদেরও একটু রাগিয়ে দিতে হয়।

রাজা দুষ্যন্তের বীরত্বের এমনই খ্যাতি যে স্বর্গ থেকেও মাঝে মাঝে তাঁর এমন ডাক পড়ে। এবারেও দেব-দানবের লড়াইয়ে দেবতাদের সাহায্য করার জন্য তিনি মাতলির রথে উঠে স্বর্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

॥ চার ॥

যুদ্ধে দেবতাদেরই জয় হয়েছে। দারুণ সাহসের সঙ্গে লড়াই করার জন্য দেবতারা রাজা দুষ্যন্তকে খাতির করলেন খুব। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁর গলায় মন্দার ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছেন রাজার গলায়।

এবার আবার পৃথিবীতে ফিরে যাবার পালা।

মাতলির রথের ওপর থেকে সব দেখতে দেখতে নামলেন রাজা। ক্রমশ পৃথিবীর পাহাড়গুলি উঁচু হয়ে উঠছে, গাছগুলিকে বড় হতে দেখা যাচ্ছে। এক জায়গায় এক সুন্দর, বিশাল পর্বতমালা দেখে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, মাতলি, ঐ পর্বতের নাম কি! আগে তো কখনো দেখি নি?

মাতলি বললেন, এই হলো হেমকূট পর্বত। এখানে কিন্নরদের বাস। খুব বড় বড় মুনি ঋষিরাও এখানে থাকেন। আর থাকেন মরীচি পুত্র প্রজাপতি মারীচ আর তাঁর পত্নী অদিতি। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে এই প্রজাপতি মারীচ আর অদিতিই হলেন সমস্ত দেবতাদের পিতা-মাতা।

হেমকূট পাহাড়ের মাথায় তখন সোনালী আগুন জ্বেলে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন রাজা। তিনি বললেন, এখানে একবার নেমে ঐ দু'জনের সঙ্গে একটু দেখা করে যাওয়া যায় না?

মাতলি বললেন, কেন যাবে না। আসুন, আমরা এখানে নামি।

রথ নামল সেই পর্বতে। সে জায়গাটি যেন স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। একটা অশোকগাছের নিচে রাজাকে দাঁড় করিয়ে মাতলি বললেন, আপনি এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমি দেখে আসছি। প্রজাপতি মারীচ এখন ব্যস্ত আছেন কি না।

রাজা সেই অশোকবনে ভ্রমণ করতে লাগলেন।

হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন বলে উঠল, আরে, আরে, আরে!

তিনি চমকে তাকিয়ে দেখলেন, একটি পাঁচ ছ'বছরের বালক হেলতে দুলতে ছুটে আসছে সেদিকে আর দু'জন তাপসী তাকে ধরবার জন্য আসছে পেছনে পেছনে।

তারপর সেই ছেলেটি একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল।

একটি সিংহীর কোলের কাছে বসে একটি সিংহশিশু দুধ পান করছিল। সেই বালকটি জোর করে সিংহশিশুটিকে সেখান থেকে তুলে এনে দৌড়ে এল। ছেলেটির গায়ে দারুণ জোর, কারণ একটা সিংহের বাচ্চাও তো কম ভারী নয়। তাকে সে কোলে তুলতে পারে। সে আবার সিংহের বাচ্চাটার মুখ টেনে ফাঁক করে বলল, দেখি, দেখি, তোর কটা দাঁত গুণব!

তাপসী দু'জন কাছে এসে বলল, বাবা, কী দস্যি ছেলে! এই সর্বদমন, শিগগির ওকে ছেড়ে দে! নইলে ওর মা সিংহী এসে তোকে কামড়াবে!

সর্বদমন নামে ছেলেটি ঠোঁট উল্টে বললো, ভারী আমি ভয় পাই! আসুক না!

এক তাপসী বলল, লক্ষীটি, ওকে ছেড়ে দে! তোকে অন্য খেলনা দেব!

সর্বদমন হাত বাড়িয়ে বলল, কই দাও!

তখন সেই তাপসী অন্য তাপসীকে বলল, যা তো, ওর জন্য মাটির পাখিটা নিয়ে আয়!

রাজা দূর থেকে মুগ্ধভাবে বালকটিকে দেখছিলেন। যেমন সুন্দর তার চেহারা, তেমন তার তাজ। রাজার নিজের কোনো পুত্র নেই। তাই ছেলেটিকে তাঁর খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে হল। তিনি কাছে এগিয়ে এলেন।

রাজাকে দেখে এক তাপসী বলল, দেখুন না ও সিংহশাবকটিকে কত কষ্ট দিচ্ছে। ওর হাত থেকে ওটা ছাড়িয়ে দিতে পারেন ?

রাজা সর্বদমনকে বললেন, তুমি ঋষির ছেলে, এমন নিষ্ঠুরতা তোমায় মানায় না। ওকে ছেড়ে দাও, বৎস।

তাপসী বলল, ও ঋষির কুমার নয়।

রাজা বললেন, চেহারা দেখে আমারও তাই মনে হচ্ছিল। তবে এ কার পুত্র ? এই পবিত্র স্থানে এল কী করে ?

তাপসী বলল, ওর মা এক অপ্সরার মেয়ে। সেইজন্যই ওরা এখানে স্থান পেয়েছে। ঐ ছেলেটি পুরু বংশের।

রাজার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ওর বাবার নাম কী ?

তাপসী এবার রাগ করে বলল, যে রাজা তার নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তার নামও আমি উচ্চারণ করতে চাই না !

রাজা আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। তিনি কাছে গিয়ে ছেলেটির গায়ে হাত দিলেন। তাতে তাঁর শরীরে যেন একটা আনন্দের স্রোত বয়ে গেল। তিনি তখন জড়িয়ে ধরলেন সর্বদমনকে।

সর্বদমন ছটফট করে বলল, ছেড়ে দাও ! আমি আমার মায়ের কাছে যাবো।

রাজা আগেই দেখেছেন যে ছেলেটির হাতে রাজচিহ্ন রয়েছে। তাঁর মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। তিনি সর্বদমনকে বললেন, পুত্র, চল। আমরা দু'জনে একসঙ্গে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

সর্বদমন বলল, পুত্র পুত্র বলছ কেন ? আমার বাবা মহাবীর দুষ্যন্ত, তুমি নও !

এই সময় ছেলের খোঁজে শকুন্তলা এসে পড়ল সেখানে। রাজাকে দেখে প্রথমটায় সে চিনতে পারে নি। তারপরই চিনতে পেরে সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সর্বদমন ছুটে গিয়ে মাকে

জড়িয়ে ধরে বলল, মা, এই লোকটা আমায় পুত্র পুত্র বলছে কেন? এ কে?

শকুন্তলা বলল, বাছা, নিজের ভাগ্যকে তা জিজ্ঞেস কর।

তখন রাজা হাঁটু গেড়ে বসে শকুন্তলার পা ছুঁয়ে বললেন, তুমি ক্ষমা কর, শকুন্তলা। আমি না জেনে তোমার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। যে অন্ধ, তার গলায় কেউ একটা মালা পরিয়ে দিলেও সে সাপ ভেবে দূরে ছুঁড়ে দেয়। আমি সেই রকম হয়ে গিয়েছিলাম।

শকুন্তলা রাজার হাত ধরে বলল, আর্যপুত্র, উঠুন। বোধহয় আমার পূর্বজন্মের কোনো পাপের জন্যই আমি শাস্তি পেয়েছি। কিন্তু এখন আমার কথা আপনার মনে পড়ল কী করে?

রাজা হাতের আংটিটি দেখিয়ে বললেন, এই ছ্যাখ, এটা ফিরে পাবার পরই আমার সব মনে পড়েছে। এই ক'বছর তুমি যেমন কষ্ট পেয়েছ। আমিও তেমন কষ্ট পেয়েছি তোমার জন্য।

রাজা ও শকুন্তলা দু'জনেই চোখের জল ফেলতে লাগলেন। কিন্তু এই কান্না আনন্দের।

তারপর সর্বদমনের হাত ধরে রাজা এবং শকুন্তলা প্রজাপতি মরীচি এবং দেবমাতা অদিতির কাছে আশীর্বাদ নিতে গেলেন। সেইদিনই তাঁরা ফিরে এলেন হস্তিনাপুরে। রাজা দুষ্যন্তের রাজ্যে আবার প্রবল আনন্দ ও শান্তি ফিরে এল।

রাজা দুষ্যন্তের ঐ ছেলে সর্বদমনের আর এক নাম ভরত। সেই ভরতের নামেই আমাদের এই দেশের নাম হয়েছে ভারতবর্ষ।

কিরাতার্জুনীয়

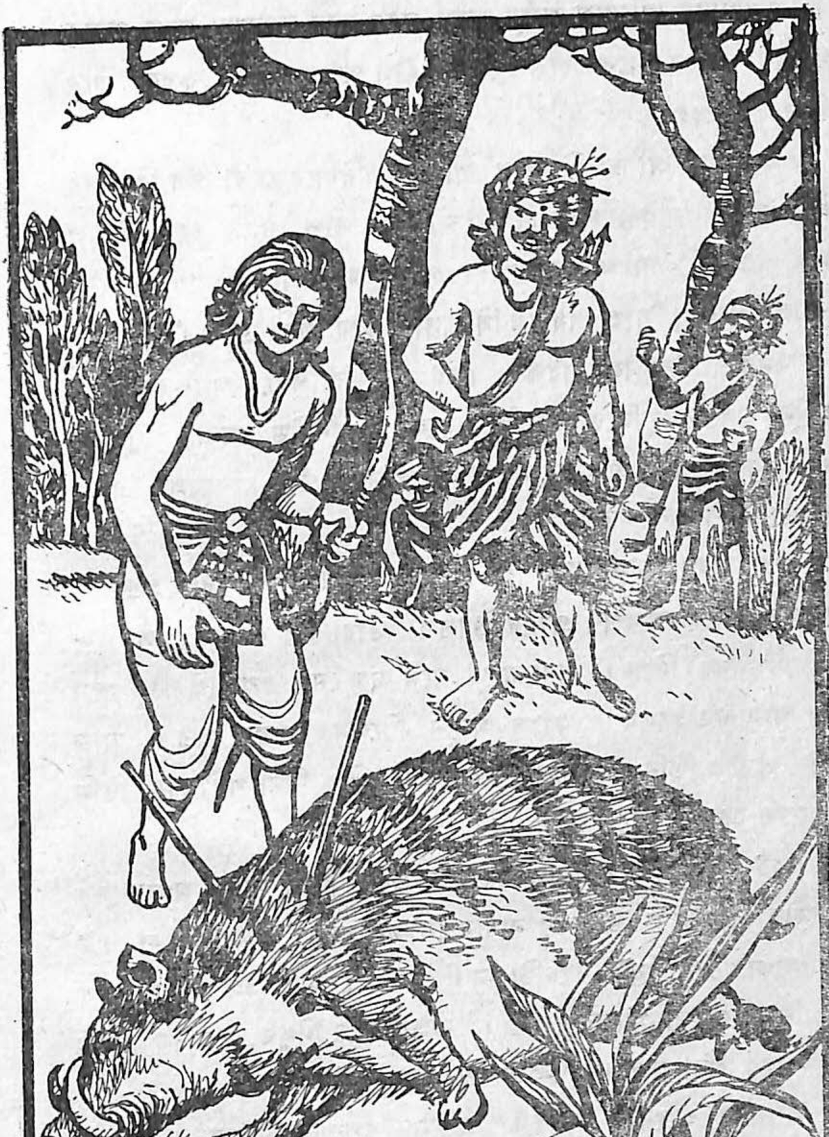
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

এ হলো বনবাস পর্বের কথা। পাশা খেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে বাস করছেন। রাজ্যহারা যুধিষ্ঠির। কিন্তু তিনি দূতের মুখে রাজ্যের সব খবর পেতেন। একদিন খবর এল দুর্যোধন বহু রাজ্য জয় করে শক্তিবৃদ্ধি করেছেন। আজ তার অনেক সৈন্য সামন্ত হাতী ঘোড়া। রাজারা যেমন মান্য করে প্রজারাও তেমনি পদানত।

শত্রুর বাড়বাড়ন্ত অবস্থার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন দ্রৌপদী, ধৈর্য হারালেন ভীম। কিন্তু অধৈর্য হলে তো চলবে না। যুধিষ্ঠির বোঝালেন সে কথা। তিনি বললেন, "হঠাৎ কোনো কাজ করা ঠিক নয়। ফল পেতে হলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।"

নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় সেখানে এলেন ব্যাসদেব। ব্যাসদেবকে দেখে নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। তারপর যথাযোগ্য সমাদরে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসালেন। বললেন, "আজ আমার সাধনা সফল হলো। বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি ?"

ব্যাসদেব বললেন, তোমার শত্রুরা এখন শক্তিশালী। যুদ্ধ করেই তোমাকে রাজ্য লাভ করতে হবে। তার জন্যে শক্তির প্রয়োজন। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণের মতো বীর যাতে পরাজিত হয় এমন অস্ত্র অর্জুনকে লাভ করতে হবে। তার জন্যে তপস্যার প্রয়োজন। আমি অর্জুনকে সেই তপস্যার মন্ত্র দান করব বলে এসেছি।



যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন দীক্ষা গ্রহণ করে তপস্যার জন্যে প্রস্তুত হলেন। এখন তাকে যেতে হবে ইন্দ্রনীল পর্বতে, লাভ করতে হবে ইন্দ্রের অনুগ্রহ।

অর্জুনের আসন্ন বিচ্ছেদে পাণ্ডব পরিবারে দেখা দিল বিষাদের কালোছায়া। কিন্তু কর্তব্যের কাছে শোক তাপ স্থায়ী হতে পারল না। দ্রৌপদী অমঙ্গল অশ্রুধারা গোপন করে তাঁকে বিদায় দিলেন। কেবল বললেন, "যাও সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ফিরে এসো।"

রমনীয় ইন্দ্রনীল পর্বত। সেই পর্বতের শিখরে আরোহণ করে অর্জুন এক বনভূমিতে উপস্থিত হলেন। নিবিড় অরণ্য, পুষ্পিত লতা বিতান সে এক পরম পবিত্র স্থান। তাঁর মনেহলো এটাই তপস্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

শুরু হলো অর্জুনের তপস্যা। তার কঠিন তপস্যা দেখে ইন্দ্রনীল পর্বতের বনচর রক্ষকগণ প্রমাদ গুণল। তারা ভয় পেয়ে গেল ইন্দ্র পুরীতে খবর দিতে। বনচরদের মুখে অর্জুনের তপস্যার কথা শুনে ইন্দ্র আনন্দিত হলেন। কারণ অর্জুন ছিলেন ইন্দ্রের পুত্র। আজ সেই পুত্রকে তিনি ভক্তরূপে পেয়েছেন। কিন্তু বিনা পরীক্ষায় তিনি পুত্রকেও বরদান করতে রাজি নন।

তাই অর্জুনের মনোবল পরীক্ষার জন্যে তিনি স্বর্গের অপ্সরাদের আহ্বান করলেন। জগতের নানান সৌন্দর্য সংগ্রহ করে বিধাতা এই সব অপ্সরাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তাই যেমন ছিল তাদের রূপ তেমনি ছিল নাচগানের দক্ষতা। কলাবিদ্যায় নিপুণ একাদশ গন্ধর্ব সঙ্গে করে তারা অর্জুনের তপস্যা ভঙ্গ করতে চলল।

মনোরম ইন্দ্রনীল পর্বত। অর্জুন তপস্যায় বসেছেন। সহসা বেজে উঠল সুন্দরীদের নূপুরের ধ্বনি। পর্বতের গুহায় গুহায় তার প্রতিধ্বনি হলো। তপস্যারত অর্জুনকে দেখে সুন্দরীরা ভাবলেন তারা কত মুনি ঋষির ধ্যান ভঙ্গ করেছেন কিন্তু আজ বুঝি তাদের সব শ্রম সব সাধনা সার্থক হলো। অপ্সরাদের ইঙ্গিতে গন্ধর্বগণ আকাশে

বীণা আর মৃদঙ্গ বাজাতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে বনভূমিতে নামল এক সঙ্গে ছটি ঋতু। আকাশ ছেয়ে গেল সজল মেঘে, এল বর্ষা। পরে কুমুদবনের শুভ্র শাড়ী পরে বাণবৃক্ষের পুষ্পবাণ নিয়ে নববধূর মতো এলেন শরৎ ঋতু। বিকশিত কুন্দ কুসুমের সুগন্ধ বয়ে আনল হেমন্ত। এল শীত। বোঝা গেল হেমন্তের অবসান হয়ে গেছে, সামনেই বসন্তের সূচনা। এইভাবে একে একে এসে দাঁড়াল বসন্ত আর গ্রীষ্ম। আকাশে বীণা বাজিয়ে প্রকৃতির রাজ্যে ছটি ঋতু সাজিয়ে সুন্দরীরা অর্জুনের মন ভোলাবার চেষ্টা করল।

কিন্তু শত প্রলোভনেও অর্জুনের মন টলল না। তিনি এক মনে ইন্দ্রের আরাধনা করে চললেন। ইন্দ্র তুষ্ট হলেই তিনি পাবেন শত্রু জয়ের অমোঘ অস্ত্র। তাই ব্যর্থ হলো অপ্সরাদের সাজ-গোজ-নাচ-গান আর প্রেম নিবেদন।

মুখ কালো করে সুন্দরীরা ফিরে গেল ইন্দ্রের কাছে। গিয়ে বলল অর্জুনের শক্তি আর সংযমের কথা। শুনে তুষ্ট হলেন ইন্দ্র। মনে মনে ভাবলেন অর্জুন তো আমারই উপযুক্ত সন্তান। কিন্তু বর দেবার আগেও আর একবার পরীক্ষা করতে চাইলেন তিনি। এক বৃদ্ধ ঋষির বেশ ধরে চললেন অর্জুনের আশ্রমের দিকে।

অর্জুন দেখলেন জটাজুটধারী এক বৃদ্ধ ক্লান্ত ঋষি যেন দীর্ঘপথ পর্যটন করে তার আশ্রমের দিকে আসছেন। অর্জুন তাকে সমাদরে ডেকে এনে আসনে বসালেন, ফলমূল দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন।

অর্জুনের সেবায় প্রীত হয়ে ছদ্মবেশী ইন্দ্র বললেন তরুণ বয়সেই তোমাকে তপস্যা করতে দেখে আমি আনন্দিত হয়েছি। তোমার এই উদ্যম অভিনন্দন যোগ্য। তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ রূপ যৌবন বিষয় আশয় শরৎকালের মেঘের মতো ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা তোমার এই বিপরীত বেশ কেন? তপস্বীদের মতো অজিন আর বল্কল না পরে ক্ষত্রিয় বীরের মতো তুমি কেন চর্ম বর্ম ধারণ করে তপস্যা করছ? তাছাড়া তুমি মুক্তিকামী, কারও উপর তোমার

প্রতিহিংসা থাকার কথা নয়, তবে কেন এই বিশাল ধনু আর খড়্গ।

ইন্দ্রের কথা শুনে অর্জুন নিজের পরিচয় দিয়ে পাশা খেলা থেকে শুরু করে তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী শোনালেন। কপট পাশা খেলায় হেরে যুধিষ্ঠির ভাইদের হারালেন, হারালেন রাজ্য, হারালেন দ্রৌপদীকে। তারপর কৌরব সভায় দৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডবের সেই অপমান কাহিনী। কোনো কথা বলতে আর বাকি রাখলেন না তিনি।

অবশেষে একথা জানালেন, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আদেশে তিনি এই ব্রত যাপন করছেন। কঠোর সাধনায় ইন্দ্রকে তুষ্ট করে লাভ করবেন দিব্য অস্ত্র আর সেই অস্ত্রে গ্রহণ করবেন চরম অপমানের প্রতিশোধ।

অর্জুনের কথা শুনে ইন্দ্র নিজমূর্তি প্রকাশ করে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, বৎস, তুমি মহাদেবের আরাধনা কর। তিনি তুষ্ট হলেই তোমার মনবাসনা পূর্ণ হবে। এই বলে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন।

ইন্দ্রের আদেশে এবার শুরু হলো মহাদেবের তপস্যা। এ তপস্যা আরও কঠিন-কঠোর। এইভাবে অনেক দিন গেল।

এদিকে ইন্দ্রনীল পর্বতে যে সব সিদ্ধ তাপসরা থাকেন তাঁরা অর্জুনের তেজ সহ্য করতে পারলেন না। তাই সদলবলে গেলেন শিবের কাছে। হিমালয়ের শীর্ষে। শিবের ধ্যান ভঙ্গ করে তাঁর কাছে নিবেদন করলেন ইন্দ্রনীল পর্বতের সেই অভিনব তাপসের কথা। যার দেহ বিত্রাসুরের মতো বিশাল আর তেজে বুঝি সূর্যদেবও পরাজিত। সেই তেজস্বী পুরুষ অস্ত্র হাতে নিয়ে কঠোর তপস্যায় বসেছেন, আবার বুঝি কোনো শক্তিমান স্বর্গরাজ্য অধিকার করে দেবতাদের বিতাড়িত করবেন।

ঋষিদের কথা শুনে শিব বললেন, তোমাদের ধারণা ভুল। এই তাপস হলেন স্বয়ং অর্জুন। অর্জুন এবং কৃষ্ণ প্রজাপতির প্রার্থনায় অসুর বধ করে প্রজাদের রক্ষা করবার জন্যে মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ

করেছেন। শত্রু জয়ের জন্যেই অর্জুন এখন আমার তপস্যায় রত।

মহাদেবের কথা শুনে ঋষিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মহাদেব বললেন, মূক নামে এক দানব বরাহ রূপ ধরে অর্জুনকে বধ করতে চলেছে। দানবের বিশ্বাস দেবতাদের শক্তিবৃদ্ধির জন্যেই অর্জুন তপস্যা করছেন। তাই সে অর্জুনকে হত্যা করতে চায়। আমি ইন্দ্রনীল পর্বতে গিয়ে অর্জুনের সঙ্গে মৃগয়া-কলহ করতে চাই। প্রথমে কিরাতরূপ ধারণ করে সেই বরাহরূপী দানবের দিকে বাণ নিক্ষেপ করব। অর্জুনও অস্ত্র নিক্ষেপ করবেন! দুজনের অস্ত্রেই মৃত্যু হবে দানবের। আর আমাদের শুরু হবে কপট কলহ।

এই কথা বলে শিব এক কিরাত সেনাপতির রূপ ধারণ করলেন। গলায় পড়লেন গজমুক্তার মালা, লতাপাতা গুঁজলেন মাথায়, কপালে পরলেন শিখিপুচ্ছ। তাঁর চোখ হলো লাল, হাতে নিলেন বিশাল ধনুক। দেখে মনে হলো যেন মৃগয়ায় চলেছেন কোন কিরাত সেনাপতি। কেবল শিব নয় তার অনুচররাও কিরাতের রূপ ধরে চলল শিবের সঙ্গে। যেন কিরাত সৈন্য।

তারা ইন্দ্রনীল পর্বতের অরণ্যে গিয়ে ভীষণ শব্দ করে পশুদের আক্রমণ করল। সেই শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠল। আর্তনাদ করে ছুটল পশুপাখির দল, যে যেদিকে পারে।

ওদিকে তখন সেই বিশাল দানব বরাহ রূপ ধরে অর্জুনের দিকে ছুটে চলেছে। অর্জুনকে বধ করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু কিরাতরূপী শিব তা সহ্য করবেন কেন? তিনি চলেছেন বনের পথে লতাপাতার আড়ালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে।

সেই বিশাল বরাহ অর্জুনেরও চোখে পড়ল। তিনি ভাবলেন এ বরাহ নিশ্চয়ই কোন মায়াবী দানব। তা নইলে পাহাড় পর্বত আর শালগাছের গুড়ি ভেদ করে সাধারণ বরাহ তো ছুটে আসতে পারে না। তাছাড়া এই তপোবনে তপস্যার প্রভাবে পশুরাও আজ

হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করেছে। তবে এ বরাহ তাকে বধ করতে চায় কেন ?

সাত পাঁচ ভেবে অর্জুন ঠিক করলেন এ বরাহকে বধ করতেই হবে—"কারণ পণ্ডিতেরা শত্রুনাশকে পরম লাভ বলে থাকেন।"

এই ভেবে অর্জুন তাঁর গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করলেন। এদিকে কিরাতরূপী শিবও তাঁর বিশাল ধনুতে এক বাণ জুড়লেন। ভীষণ শব্দে আকাশ আলো করে দুটি বাণ ছুটে চলল। একটি অর্জুনের অন্যটি শিবের। বাণ দুটি গিয়ে বিঁধল বরাহ দানবের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে তার ভবলীলা সাঙ্গ হলো।

বরাহ বধ করার পর অর্জুন নিজের সেই প্রিয় বাণটিকে তুলে আনতে গেলেন। কিন্তু শিবের মায়ায় সে বাণ তখন অদৃশ্য। অন্য বাণের দিকে হাত বাড়াতেই সামনে এসে দাঁড়াল এক কিরাত দূত। প্রথমে সেই দূত অর্জুনের অনেক প্রশংসা করল। তারপর বলল, যে বাণটিকে আপনি নিজের বলে মনে করছেন সে বাণ আপনার নয়। আমার প্রভু কিরাতরাজ এই বাণ ছুঁড়েই বরাহ মেরে আপনার প্রাণ রক্ষা করেছেন। তাছাড়া কিরাতরাজের আঘাত করা পশুকে বধ করাও আপনার উচিত হয়নি। এখন যদি বাণ হরণ না করে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন তাহলে কেবল একটা মাত্র সুবর্ণ-বাণ কেন তিনি তার সঙ্গে বহু সম্পদ আপনাকে দান করবেন।

দূতের কথায় অর্জুনের রাগ হলো। কিন্তু বাইরে সে ভাব প্রকাশ করলেন না। তিনি কেবল জানালেন অন্যের বাণে তাঁর প্রয়োজন নেই। কারণ খাণ্ডব বন দহনকালে অগ্নিদেব তাকে অসংখ্য বাণ দিয়েছেন। তাছাড়া কিরাতরাজ আগেই যে অস্ত্র ছুঁড়েছেন তারও কোনো প্রমাণ নেই। আর বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। আমি কিরাত-রাজের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেও চাই না, বাণও দেব না।

অর্জুনের এই কথা শুনে কিরাত দূত ফিরে গেল। গিয়ে সব কথা জানাল তার প্রভুকে। শুনে তার প্রভু গর্জন করে উঠলেন।

চারিদিকে পড়ে গেল সাজ সাজ রব। অস্ত্রের শব্দে আর কিরাত সেনার সিংহনাদে কেঁপে উঠল পর্বতমালা, কেঁপে উঠল ধরাতল। দলবল নিয়ে কিরাতরাজ অর্জুনকে আক্রমণ করলেন।

কিরাত বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে অর্জুন হাতে তুলে নিলেন তার গাণ্ডীবধনু। যদিও অনেকদিন তপস্যা করে তাঁর দেহ আজ কৃশ। কিন্তু আসন্ন যুদ্ধের আহ্বানে তিনি হয়ে উঠলেন ভীষণ। তাঁর আক্রমণ কেউ সহ্য করতে পারল না। তখন কিরাত সেনারা এক-যোগে তার দিকে বাণ নিক্ষেপ করতে লাগল। যুদ্ধের আহ্বানে অর্জুনের রক্তে রক্তে জেগে উঠল সেই মহাবীর ফাল্গুনী। তাঁর বাণে বাণে আকাশ কালো হয়ে সূর্য ঢাকা পড়ল আর কেঁপে উঠল পৃথিবী।

অর্জুনের ক্ষমতা দেখে প্রমাদ গুণলেন শিবসেনা। তাদের একবার মনে হলো বুঝি দেবতারাই মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করছেন। তা না হলে এত বাণ আসবে কোথা থেকে।

যাই হোক অর্জুনের বাণের আঘাত সহ্য করতে না পেরে কিরাত সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিল। কিন্তু তাদের আবার উৎসাহ দিয়ে উত্তেজিত করে যুদ্ধে ফিরিয়ে আনলেন দেবসেনাপতি কার্তিক। তিনি কিরাত-বেশী শিব-সেনাদের ডেকে বললেন, "যুদ্ধ ছেড়ে এভাবে পালানো ঠিক নয়। এই তপস্বী দেবতাও নয় দানবও নয়—একজন মানুষ, তবে তাকে কিসের ভয়।"

কার্তিকের এই কথায় ফিরে এল প্রথম বাহিনী। এবার তাদের উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে এলেন স্বয়ং কিরাতরূপী মহাদেব। আরম্ভ হলো কিরাত-অর্জুনের যুদ্ধ। কিরাত বাণ ছোড়েন, কেঁপে ওঠে ইন্দ্রনীল পর্বত, চারিদিক আলো করে ছোটে সেই বাণ, কিন্তু মাঝপথেই সেই বাণকে কেটে খণ্ড খণ্ড করেন অর্জুন। আবার অর্জুন যে বাণ ছোড়েন কিরাতের বাণে তার গতি হয় রুদ্ধ।

এইভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলল। কিরাতকে যুদ্ধে হারাতে না পেরে অবাক হলেন অর্জুন। রাগে তাঁর শরীর জ্বলতে লাগল। অনেক

—১০

ভেবে চিন্তেও তিনি এর কারণ খুঁজে পেলেন না।

এরপর অর্জুন প্রয়োগ করলেন নিদ্রাকর্ষী অস্ত্র। চারিদিক নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে নেমে এল গভীর রাত। কিরাত সেনাদের চোখের পাতা এল ভারি হয়ে। নামল ঘোর নিদ্রা। কিন্তু তা কেবল মুহূর্ত-কালের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে কিরাতরূপী শিবের ললাট থেকে বিচ্ছুরিত চাঁদের আলোয় সেই অন্ধকার কেটে গেল। আলোয় আলোয় ভরে উঠল ভুবন। সেই আলোকে সূর্য মনে করে তপস্বীরা প্রণাম জানালেন।

নিদ্রাকর্ষী বাণ ব্যর্থ হলে অর্জুন এবার সর্পাস্ত্র ছুঁড়লেন। বাণ ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শত শত ভুজঙ্গের দল আকাশ কালো করে লকলকে জিব বের করে ছুটে চলল। সঙ্গে সঙ্গে শিব গরুড়মন্ত্র যপ করে নাগদলকে নিবৃত্ত করলেন। সর্পাস্ত্র ব্যর্থ হলে ক্রুদ্ধ অর্জুন এবার ছুঁড়লেন অগ্নিবাণ। তেজে সূর্য কিরণকে ভেদ করে চারিদিকে আগুন বৃষ্টি করে সে বাণ ছুটে চলল। শিব তখন প্রয়োগ করলেন বরুণ বাণ। যে বাণের প্রভাবে আকাশে জমা হলো কাল মেঘ। আর সেই মেঘ থেকে আকাশ গঙ্গার মতো ঝরে পড়তে লাগল জলধারা।

জলবর্ষণে অগ্নিবাণের তেজ খর্ব হলো। এইভাবে সব্যসাচী অর্জুন যে বাণই প্রয়োগ করেন কিরাতরূপী শিব তাকে খণ্ডন করেন।

অগ্নিবাণ ব্যর্থ হলে ক্রুদ্ধ অর্জুন শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন করলেন। কিন্তু এক সময় তাঁর অক্ষয় তূণ শিবের মায়ায় বাণশূন্য হলো। বিস্মিত হলেন অর্জুন।

এদিকে ছুটে আসছে অসংখ্য বাণ। সেই বাণের আঘাতে অর্জুনের বর্ম খসে পড়ল। আহত হলেন তিনি। তখন দলিত ভুজঙ্গের মতো কেবল ধনুকটিকে হাতে নিয়ে তিনি কিরাতপতিকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। শিব জয় করলেন তাঁর ধনুক। এখন একমাত্র সম্বল তাঁর খড়্গ। সেই খড়্গ দিয়েই অর্জুন শিবের বাণ প্রতিহত করতে লাগলেন। কিন্তু তাই বা কতক্ষণ। এক সময়

কিরাতের বাণে তার সেই খড়্গ খণ্ডিত হয়ে পড়ল মাটিতে।

ধনু নেই, বাণ নেই, বর্মহীন অর্জুনের একমাত্র খড়্গ তাও হলো খণ্ডিত। এখন বাহু ছাড়া অর্জুনের দ্বিতীয় কোনো অস্ত্র নেই। সেই বাহুকে সম্বল করেই অর্জুন যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। বড় বড় পাথর তুলে ছুঁড়ে মারলেন তিনি শিবের দিকে। কিন্তু শিবের বাণে সেগুলি খণ্ড বিখণ্ড হলো। তখন দুহাতে বিশাল গাছ তুলে তিনি ছুঁড়তে লাগলেন। তাতেও কিছু হলো না।

তখন অর্জুন এসে দাঁড়ালেন কিরাতরাজের মুখোমুখি। এবার শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। দুজনের মুষ্টিযুদ্ধের শব্দ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। এক সময় অর্জুনের দুই কাঁধে শিব এমন প্রহার করলেন যে তিনি টলতে টলতে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু পরাজয় তাঁকে এনে দিল উৎসাহ। তিনি পাল্টা আক্রমণ করলেন। আরম্ভ হলো মল্লযুদ্ধ। দুজনের পদভারে টলে উঠল পৃথিবী। মল্লযুদ্ধে অর্জুনের দক্ষতা দেখে কিরাতরূপী শিব তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে নিজের বুকে চেপে ধরলেন। অর্জুনের তপস্যার চেয়ে তার বীরত্বেই শিব খুশি হলেন।

অর্জুনকে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করে শিব নিজমূর্তি ধারণ করলেন। শিবকে চিনতে পেরে অর্জুন হলেন অভিভূত। তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে সঙ্গে শিবের বরে তিনি ফিরে পেলেন তাঁর অস্ত্র আর বর্ম।

আকাশ থেকে ঝরে পড়ল বিচিত্র পারিজাত ফুল। আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল দুন্দুভির শব্দ। ইন্দ্রসহ এলেন দেবগণ। সকলের মুখেই অর্জুনের প্রশংসা।

অর্জুন তখন একমনে শিবের স্তব করে চলেছেন। তাঁর প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে শিব তাকে পাশুপত অস্ত্র ধারণের উপযোগী ধনুর্বেদ শিক্ষা দিলেন। দেবতারাও দিলেন নানা অস্ত্র আর করলেন শত্রুজয়ের আশীর্বাদ।

শিবের আশীর্বাদ ও দেবতাদের অভিনন্দন লাভ করে অর্জুন ফিরে এলেন তাদের সেই দ্বৈতবনের পাতার কুটিরে যুধিষ্ঠিরের পদপ্রান্তে।